ইসলামের ওপর অভিযোগ

এবং

দলিলভিত্তিক জবাব

Questions on Islam & Documentary Answers

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা

সৃষ্টির আদি থেকেই বিভিন্ন প্রশ্ন মানব মনকে করেছে কৌতুহলী। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে তারা বিভক্ত হয়েছে নানা মত ও পথে। সত্য-মিথ্যার ফারাক নির্ণয় করতেও তাদের প্রশ্নগুলো কখনো কখনো প্রকাশ পেয়েছে অভিযোগের সুরে। জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এ সম্পর্কে কিছু লোকের মনে বিভিন্ন সংশয় ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে কুরআনের মহাজাগতিক ব্যাখ্যা, নারী পুরুষের অধিকার, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় রীতি-নীতির পার্থক্য ইত্যাদি মৌখিক বিষয়ে মুস-লিম, অমুসলিম নির্বিশেষে অনেক মানুষই নানান সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। এসব প্রশ্ন কখনো হয়ে থাকে মুখোরোচক ও আক্রমণাত্মক আবার কখনো হয়ে থাকে অগভীর চিন্তার পরিচায়ক। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দলিলভিত্তিক জবাব রয়েছে এখানে। ইসলাম যেহেতু স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির জন্য দিকনির্দেশনা এবং প্রকৃতির ধর্ম তথা 'দ্বীনুল ফিতর' তাই মানব প্রকৃতিকে সান্ত্বনা ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন বৈশিষ্ট্যই রয়েছে জবাবগুলোতে। প্রশ্নগুলোর বেশীর ভাগই ইসলামি শরীয়াহ তথা বিধি-বিধান নির্ভর। অভিযোগগুলো কখনও কখনও আক্রমণাত্মক হলেও জবাবের ক্ষেত্রে প্রতিটি আক্রমণের পথ পরিহার করা হয়েছে। সেজন্য জবাবগুলোও দেয়া হয়েছে একাডেমিক এবং দালিলিক। প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার বাইরেও জবাবে উঠে এসেছে অনেক অজানা তথ্য যা প্রতিটি প্রসঙ্গকেই প্রাণবন্ত করেছে।

প্রশ্ন : সব মানবধর্মই ভালো কাজের শিক্ষা দেয়, তারপরও কোনো ব্যক্তিকে ইসলামের অনুসরণ করতে হবে কেনো? কী কারণে তিনি অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ করতে পারবেন না?

ইসলাম স্রষ্টার মনোনীত জীবনবিধান

উত্তর : মূল ভিত্তিসমূহের বিবেচনায় সকল ধর্মই মানুষকে সঠিক পথে চলার এবং খারাপ পথ পরিহারের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম এসব থেকে উৎকৃষ্ট। ইসলাম সরল পথে চলতে এবং একক ও সমষ্টিগত জীবনকে যাবতীয় মন্দকাজ থেকে বাঁচার জন্য কর্মের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মানুষের জীবন-প্রকৃতি ও সামাজিক সমস্যাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। এটা মূলত 'স্রষ্টার পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা।' এজন্য ইসলামকে ফিতরৎ বা প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়।

ইসলাম এবং অপরাপর ধর্মের মৌলিক পার্থক্যগুলো কয়েকটি বিষয় দ্বারা স্পষ্ট হবে। সকল ধর্মই এ শিক্ষা দেয় যে চুরি, লুন্ঠন এবং হানাহানি খারাপ কাজ। ইসলামও এসব কথাই বলে। তাহলে ইসলামের সাথে অন্য ধর্মগুলোর পার্থক্য কী? পার্থক্যটা হলো ইসলাম চুরি ও লুটতরাজ মন্দ কাজ হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি এমন বিধানও দেয় যেনো লোকজন লুটতরাজ না করে। যেমন–

মানবকল্যাণের জন্য ইসলাম যাকাতের বিধান রেখেছে। ইসলামী শরীয়া মতে, যার সম্পদ পচাঁত্তর গ্রাম অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা এর সমপরিমাণ পৌঁছাবে সে প্রতি বছর শতকরা আড়াই ভাগ সম্পদ বা অর্থ আল্লাহর রাস্তায় নির্ধারিত ৮টি খাতে ব্যয় করবে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি ঈমানদারির সাথে যাকাত আদায় করতে থাকে, তাহলে দুনিয়া থেকে দারিদ্র্য অপসারিত হতে বাধ্য, যা চুরি ও লুটতরাজের মূল কারণ।

ইসলাম চোরের হাত কাটার শাস্তি প্রদান করে। এটা কুরআনে সূরা মায়িদার ৩৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে -

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ

অর্থ ঃ চোর নারী হোক কি পুরুষ তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের হাত কেটে দাও, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি।

এ শাস্তির বিষয়ে অমুসলিমরা বলে, 'বিংশ শতাব্দীতেও হাত কাটার শাস্তি! ইসলাম তো জুলুম ও পশুত্বের ধর্ম।' কিন্তু এ ধরনের কথা বাস্তবসম্মত নয়। বর্তমানে আমেরিকাকে পৃথিবীর সবেচেয়ে উন্নত দেশ ভাবা হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে

এ অপরাধটি সবচেয়ে বেশি। আমেরিকাতে যদি ইসলামি আইন আবশ্যকীয় করে দেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী যদি প্রত্যেক ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, চুরির শাস্তি যদি হাত কাটা হয়, তাহলে আমেরিকায় চুরি-ডাকাতির অপরাধ কি বাড়বে, না কমবে, নাকি এমনই থাকবে? অবশ্যই কমবে এবং এ আইন বাস্তবায়িত হলে চোরের চুরি করার প্রবণতা কমতে বাধ্য। আমি এ কথার সমর্থন করি যে বর্তমানে পৃথিবীতে চোরের সংখ্যা অনেক এবং যদি হাত কাটার আইন কার্যকর হয়, তাহলে লাখ লাখ চোরের হাত কাটা পড়বে। কিন্তু এ বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে, যখনই এ বিধান কার্যকর হবে তখন মুহূর্তেই কমে যাবে চোরের সংখ্যা। তবে অবশ্যই এ বিধান কার্যকরের পূর্বে যাকাতের বিধান কার্যকর করতে হবে। সমাজে সদকা, দান এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার প্রবণতা বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রবণতা। এরপর এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে। তখন চুরি করতে হলে চোর শতবার চিন্তা-ভাবনা করে তবেই চুরি করবে। এরপরও যদি কেউ চুরি করে সে হয়তো স্বভাব চোর। কঠিন শাস্তির ভয় তাকে লুঠতরাজ থেকে বিরত রাখবে। পরবর্তীতে এ অপরাধ প্রবণতা একেবারেই কমে যাবে এবং একান্ত স্বভাব-চোরদের হাত কাটা পড়বে। ফলে লুঠতরাজের হাত থেকে চিন্তামুক্ত হয়ে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে।

প্রধানতম প্রতিটি ধর্মই নারীদের সম্মান দেয় এবং তাদের শ্লীলতাহরণকারীদের গুরুতর অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করে। এ ব্যাপারে অন্য ধর্ম থেকে ইসলামের পার্থক্য কী? পার্থক্যটা হলো ইসলাম শুধু নারীদের সম্মান দেখানোর নির্দেশই দেয় না, তাদের ইজ্জত হরণকারীর অপরাধকে গুরুতর গণ্য করে এ সংক্রান্ত জঘন্য ঘটনার পূর্ণ তদারকি করে। সমাজ থেকে এ ধরনের অপরাধ কীভাবে নির্মূল হবে তার ব্যবস্থা করে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে পর্দার মতো একটি উত্তম বিধান চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে আল কুরআন প্রথমে পুরুষকে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ ঃ হে নবী! মুমিনদের বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে ও নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য পবিত্রতর উত্তম পন্থা। তারা যা কিছু করে তা সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল।

ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি গায়রে মাহরাম কোনো নারীকে দেখে

ফেললে তার তৎক্ষণাৎ চোখ নিচু করা কর্তব্য। অনুরূপভাবে নারীর ক্ষেত্রেও পর্দার হুকুম আছে।

সূরা আন নূর এর ৩১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ـ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ـ وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আর আপনি ঈমানদার নারীদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে এবং তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, আর তারা যেন তাদের চাদর স্বীয় বক্ষের ওপর জড়িয়ে রাখে। তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে কিন্তু তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাদের ভগ্নিপুত্র, আপন স্ত্রীলোক, নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনামুক্ত নিষ্কাম পুরুষ এবং এমন বালক ব্যতীত যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ; আর তারা যেন নিজেদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

নারীর জন্য পর্দা মানে হলো সারা শরীর আবৃত থাকবে কেবল চেহারা ও হাত উন্মুক্ত রাখা যাবে তবে মহিলারা ইচ্ছা করলে এগুলোকেও ঢেকে রাখতে পারবেন। অনেক আলিমদের মতে, চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক। প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম কেনো দিলেন?

এ সম্পর্কে আল কুরআনের ৩৩ নম্বর সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ـ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বলুন, তারা

যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ উপরে টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সুন্দরী-সুশ্রী আপন দুই বোনের গল্প। ধরুন তারা পাশাপাশি এক গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একজন ইসলামি হিজাব পরিহিতা এবং দ্বিতীয়জন পাশ্চাত্য আধুনিক স্টাইলে মিনি স্কার্ট পরিহিতা। গলির মুখে এক বখাটে দাঁড়ানো আছে। এদের দুজনের মধ্যে কোন মেয়েটিকে বিরক্ত করার সম্ভাবনা বেশী? সে কাকে উত্যক্ত করবে? হিজাব পরিহিতা মেয়েটিকে; নাকি মিনি স্কার্ট পরিহিতাকে? উত্তর হবে– মিনি স্কার্ট পরা মেয়েকে। শরীর ঢেকে রাখায় মেয়েটি উত্তক্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচবে এবং বিপরীত জনের পোশাকটি উত্যক্ত হওয়ার কারণ হবে। এজন্য ইসলাম যথার্থই বলেছে, হিজাব (পর্দা) নারীকে মর্যাদাহানিকর সকল কিছু থেকে সংরক্ষণ করে।

ইসলামে ধর্ষণকারীর সাজা মৃত্যুদণ্ড। অমুসলিমরা বলে থাকে, এটা একটা মারাত্মক শাস্তি। অনেকে ইসলামকে অত্যাচারী ও পাশবিক ধর্ম বলে থাকে। আসলে এটা সত্য নয়। আমি অনেক অমুসলিমকে এ প্রশ্ন করেছি, আল্লাহ না করুন কেউ আপনার স্ত্রী, মা অথবা বোনের সাথে বাড়াবাড়ি করল, এদের ইজ্জত হরণ বা শ্লীলতাহানী করল এবং এর বিচারের জন্য আপনাকে বানানো হলো জজ বা বিচারক। এরপর অপরাধীকে আপনার সামনে হাজির করা হলো। এক্ষেত্রে আপনি তাকে কী শাস্তি প্রদান করবেন? সবাই উত্তর দিয়েছে, আমি একে হত্যা করব এবং কেউ কেউ এটাও বলেছে যে, আমি তার ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচার চালাব যতক্ষণ না তার জীবনাবসান ঘটে। যদি কেউ আপনার নিজ স্ত্রী, কন্যা, বোন অথবা মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে তাহলে আপনি তাকে হত্যা করতে চান, অথচ অন্য কারো স্ত্রী, বোন ও মায়ের সঙ্গে একই অপরাধ করলে একই ধরনের শাস্তি কার্যকর করলে তাকে কীভাবে জুলুম এবং পাশবিক কাজ বলতে পারেন? এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়?

আমেরিকাকে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র মনে করা হয়। অথচ ১৯৯০ সালে প্রকাশিত আমেরিকার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইন্টিলিজেন্স বা এফ.বি.আই. রিপোর্ট অনুযায়ী তখন দেশটিতে ধর্ষণের ১,০২,৫৫৫টি মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে এগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মোট অভিযোগের মাত্র ২১ ভাগ মামলা রেকর্ড/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাহলে সংখ্যাটি হবে ৬,৪০,৯৬৮। যদি এ সংখ্যাকে বছর থেকে দিনে পরিবর্তন করতে চান, তাহলে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ দিলে দৈনিক হিসাবে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১,৭৫৬।

পরবর্তীতে আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যাতে প্রতিদিনের ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ১৯০০-টি। আমেরিকার 'ন্যাশনাল ক্রাইম সার্ভে ব্যুরো' (N.C.S.B) এর রিপোর্টে ১৯৯২ সালে ধর্ষণের ৩,০৭,০০০টি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছিল যা ছিল মূল রিপোর্টের শতকরা ৩১ ভাগ। ধর্ষণের মূল ঘটনা ছিল ৯,৯০,৩৩২টি প্রায় দশ লাখের কাছাকাছি। অর্থাৎ এ বছর আমেরিকায় প্রতি ৩২ সেকেন্ডে ধর্ষণের মতো অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। আর আমেরিকা পরিণত হয়েছে অপরাধের এক বড় ক্ষেত্রে। ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই. (F.B.I.) রিপোর্ট অনুসারে ওখানে ধর্ষণের যে ঘটনাগুলোর রিপোর্ট করা হয়েছে সেগুলোর মাত্র শতকরা ১০ ভাগ অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে যা ছিল মোট সংখ্যার মাত্র শতকরা ১.২ ভাগ। এ ধরনের অপরাধে গ্রেফতারকৃত লোকদের শতকরা ৫০ ভাগকে মামলা নথিভুক্ত হওয়ার আগেই ছেড়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ মাত্র শতকরা ৮০ ভাগ লোককে মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের এক বছরেরও কম সময়ের জন্য জেল খাটার শাস্তি হয়েছে। আমেরিকাতে এ ধরনের অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। কিন্তু প্রথম বারে জজ (বিচারক) অপরাধীর সাথে নম্র আচরণ করে লঘু শাস্তি দেন। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন, এক ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ করল, যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা শতকরা ১ ভাগ, যার সঙ্গে শতকরা ৫০ জন জজ আপোষমূলক ব্যবহার করবে এবং এক বছরের কম সময়ের জেল দেবে।

ধরুন, আমেরিকায় যদি ইসলামি বিধান বাস্তবায়ন করা হয়, যে আইনে নির্দেশ আছে কোনো লোক যদি কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে সে দৃষ্টি নিচু করে নিবে, প্রত্যেক নারী পর্দার মধ্যে থাকবে, হাত ও চেহারা ব্যতীত সারা শরীর থাকবে আবৃত। এ অবস্থায় যদি কেউ ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ করে এবং অপরাধীকে ইসলামী আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয় তাহলে জানতে চাই এ অবস্থায় অপরাধ বাড়বে না ঐরূপই থাকবে? অবশ্যই এ ধরনের অপরাধ হ্রাস পাবে এবং এটা সম্ভব হবে ইসলামি শরিয়াত বাস্তবায়নের ফলেই। ইসলাম সর্বোত্তম জীবন বিধান। কারণ এর শিক্ষা কেবল তত্ত্বগত নয় বরং এটা মানবসভ্যতার বাস্তব সমস্যার সঠিক সমাধানও। এ কারণে ইসলাম ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে সর্বোত্তম ফলাফল লাভ করে। ইসলাম বিশ্বজনীন কর্মোপযোগী এক ধর্ম যা কোনো একক সম্প্রদায় বা গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এজন্য অন্য কোনো ধর্মমতের তুলনায় একমাত্র ইসলামই এমন ধর্ম যাকে অবলম্বন করে মানুষ নিজ জীবনের রাস্তা সুগম করে নিবে এবং নিজের আখিরাতের সফলতা অর্জন করবে। আর সেই অনন্ত জীবনের সফলতাই প্রকৃত সফলতা।

প্রশ্ন : ইসলামে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ অথচ মুসলমানগণ নিজেদের ইবাদাতের ক্ষেত্রে কা'বাকে সামনে রাখে। কেনো তারা কাবাকে পূজা করে?

পূজার জন্য নয়, কাবা দিক-নির্দেশক

উত্তর : কা'বা মুসলমানদের কিবলা বা মুখ ফিরানোর স্থান। অর্থাৎ তা এমন স্থান যার দিকে মুখ করে নামায পড়তে হয়। প্রকৃত অর্থে, মুসলমানরা কাবার দিকে মুখ ফেরায় সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে, কা'বার পূজা কিংবা তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। মুসলমান কেবল আল্লাহকে সামনে রাখে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। আল-কুরআনের সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۔

অর্থ : আমি দেখতে পেয়েছি আপনি কিবলা পরিবর্তনের জন্য আকাশের দিকে বারবার তাকাতেন সুতরাং আমি আপনার পছন্দমতো কিবলা বানিয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে মসজিদে হারামের (কা'বার) দিকে ফিরে নামায আদায় করুন।

ইসলাম ঐক্যের ধর্ম। তাই আল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে একতা ও ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কিবলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানেই থাকুন না কেনো নামাযের সময় মুখ রাখতে হবে কিবলার দিকে। যে কা'বার পশ্চিমে থাকবে সে পূর্বদিকে এবং যে কা'বার পূর্ব দিকে থাকবে সে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে।

এটা সবাই জানেন মুসলমানগণ সকলের আগে পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেন। তাদের অংকিত মানচিত্রের দক্ষিণ বা ওপরের দিকে এবং উত্তর বা নিচের দিকে ছিল এবং এর ফলে কা'বা পড়েছিল মাঝখানে। তবে বর্তমানে দক্ষিণকে নিচের দিকে দেখানো হলো। আলহামদুলিল্লাহ; কা'বা শরীফ প্রায় সেই মধ্যখানেই পড়েছে। যখন মুসলমানগণ মসজিদে হারামে যায়, তথা সে কা'বা তাওয়াফ করে। যার প্রত্যেক চক্করের একই কেন্দ্র থাকে। একই অর্থে আল্লাহ তাআলাও একজন। যিনি মাবুদ। যার সাথে হাজরে আসওয়াদের সম্পর্ক। এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) এর একটি হাদিস আছে যে, তিনি হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) এ চুম্বন করলেন এবং বললেন, 'আমি জানি, তুমি শুধুই এক খণ্ড পাথর, তুমি কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখো না। যদি আমি নবী করিম (স) কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।'

রাসূল করিম (স) এর সময়ে সাহাবীগণ কা'বার ওপর উঠে আযান দিতেন। তাই যে ব্যক্তি এ অভিযোগ উত্থাপন করে, মুসলমানগণ কা'বা শরীফের পূজা করে তার কাছে আমার প্রশ্ন– এমন কি কোনো পূজারী আছে, যে কি-না কোনো মূর্তির পূজা করে, আবার তার ওপর আরোহণ করে, দাঁড়াতে সাহস করে?

প্রশ্ন : মুসলমানগণ কীভাবে ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম বলে যেখানে ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে?

আদর্শিক গুণে প্রসার লাভ করেছে

উত্তর : কিছু অমুসলিম এ অভিযোগ উত্থাপন করে, তরবারির দ্বারা বিজয়ী না হলে মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশি হতো না। আমি যুক্তির মাধ্যমে এ অভিযোগ খণ্ডন করে স্পষ্ট করে বলতে চাই, ইসলাম তরবারি বা শক্তির জোরে প্রসারিত হয়নি বরং এটা ছড়িয়ে পড়েছে নিজস্ব বিশ্বজনীন সত্য এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রমাণের কারণে।

'ইসলাম' শব্দটির উৎপত্তি سِلْمٌ (সিলমুন) থেকে যার অর্থ سَلَامٌ (সালাম) শান্তি ও নিরাপত্তা। এ অর্থও প্রচলিত আছে যে, নিজেকে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করবে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করবে। পৃথিবীর সকল মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হতে পারে না। কারণ এমন অনেক লোক আছে যারা স্বজাতির স্বার্থের জন্য কাজ করে এবং শান্তি বিঘ্নিত করে। এখানে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগের অপরিহার্যতা নেই। এ কারণে অপরাধ দমনের জন্য প্রয়োজন হয় পুলিশ বাহিনী যারা অপরাধী এবং এ ধরনের লোকদের দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইসলাম সব সময় নিরাপত্তার প্রত্যাশী এবং শান্তির সপক্ষে কাজ করে, তবে অনুসারীদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোনো কোনো স্থানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অত্যাচারীকে উৎখাত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। নবী করিম (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে আমরা এ ধরনের দৃষ্টান্ত নিতে পারি।

উল্লিখিত অভিযোগের জবাব হচ্ছে ইসলাম তলোয়ার অর্থাৎ শক্তির মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে এটি সঠিক নয়। এক ইংরেজ ঐতিহাসিক ডি. লিসী তাঁর Islam at the Cross Road গ্রন্থে এ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থের অষ্টম পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন– পৃথিবীর ইতিহাসে এ সত্য উন্মোচিত যে ইসলাম সম্পর্কে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে– এমন মন্তব্যের কারণ, অধিকাংশ ঐতিহাসিকই ছিলেন অমুসলিম, তাই এ ধরনের অভিযোগ কম বুদ্ধি ও স্বল্পধীসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের বক্তব্য।

মুসলিমগণ স্পেনে প্রায় আটশো বছর রাজত্ব করেছেন এবং সেখানকার লোকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে কখনো তরবারির ব্যবহার করেননি। পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টানরা যখন শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতা দখল করেছে তখন মুসলমানদেরকে তরবারি দ্বারা এমনভাবে খতম করা হয়েছে যে, স্বাধীনভাবে আযান দেয়ার জন্য একজন মুসলমানও সেখানে উপস্থিত ছিল না। মুসলমানগণ ১৪০০ বছর ধরে আরববিশ্বে শাসনকার্য পরিচালনা করে আসছেন। আরবে এখনো ১৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক 'ক্যাপটিক' খ্রিস্টান রয়েছে যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খৃস্টানই রয়েছে। যেমন মিসরের কুতবী খ্রিস্টান এবং অন্যরা। যদি ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করত তাহলে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকত না। মুসলমানগণ এক হাজার বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছে যদি তারা চাইত তাহলে তারা তলোয়ারের সাহায্যে প্রত্যেক অমুসলিমকে মুসলমান বানাতে পারতো। অথচ আজকের ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায়, অমুসলিম জনসংখ্যার হার সেখানে কতটা বেশি। জনসংখ্যার হিসাবে এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেনি।

সমগ্র বিশ্বে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মালয়েশিয়ায়ও মুসলমানের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল? বরং ইসলামের বিধি-বিধান ও ন্যায়-নীতিই এমন দ্রুতগতিতে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে প্রসার লাভ করেছিল। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ বলবেন কি কোন্ ইসলামি সেনাবাহিনী আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? এর সঠিক কোনো জবাব নেই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'টমাস কার্লাইল' তাঁর 'Hero and Hero Worship' গ্রন্থে ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে লিখেছেন–

"ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে যে তরবারির ব্যবহারের কথা বলা হয় সেটা কোন্ ধরনের তরবারি? এই তরবারি এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যা অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন, যা একজনের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং সেখানেই তা লালিত এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর মাত্র একজন বিশ্বাস রাখতেন; যার সাথে সারা পৃথিবীর মানুষের চিন্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। যদি কোনো ব্যক্তি তার হাতে তরবারি নিয়ে এ মতবাদ প্রসারের চেষ্টা করে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এ তরবারির ধারকের নিজস্ব শক্তির পতন আপনা-আপনি ঘটে যাবে।"

অতএব ইসলাম তরবারির শক্তির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে– এটা ভ্রান্ত ধারণা। মুসলমানরা এটা করতে চাইলেও করতে পারতেন না। কারণ আল-কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে নির্দেশ রয়েছে–

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপার কোনো জবরদস্তি নেই, ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ পৃথক হয়েছে।

ইসলাম মূলত প্রসার লাভ করেছে সম্পর্ক জ্ঞান বা হিকমতের তরবারি দ্বারা এবং এটা এমন এক তরবারি যা হৃদয়–মনকে জয় করে। যা সম্পর্কে আল-কুরআনের ১৬ নং সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .

অর্থ : আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।

১৯৮৬ সালে 'রিডার্স ডাইজেস্ট' সাময়িকীতে, ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বড় বড় ধর্মের অনুসারীদের জরিপ চালিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে ধর্ম বর্ধনশীলদের গণনাও লেখা হয়েছে। 'The plain truth' এর মূল সূচিতে ছিল ইসলাম। যার অনুসারীদের তালিকায় শতকরা ২৩৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছে এবং খ্রিস্টধর্মে মাত্র ৪৭%। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এ পাঁচ দশকে কোন্ ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল যার কারণে লাখ লাখ মানুষ মুসলমান হয়েছে? সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকাতে সবচেয়ে বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। এটা কোন্ তলোয়ারের মাধ্যমে ঘটছে, যার কারণে বেশির ভাগ লোক মুসলমান হতে বাধ্য হচ্ছে? এ তরবারি ইসলামের সত্য শিক্ষার তরবারি। ডা. যোশেফ অ্যাডাম পিটারসন যথার্থই বলেছেন, "একদিন আনবিক অস্ত্র আরবদের হাতে আসবে বলে যারা শঙ্কিত তারা একথা জানে না যে, ইসলামি বোমা বহু পূর্বেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং তা তখনই নিক্ষিপ্ত হয়েছে যখন হযরত মুহাম্মদ (স) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

প্রশ্ন : মুসলমানদের অধিক হারে মৌলবাদী ও একমুখী দেখা যায় কেনো?

মৌলিক নীতিমালাই মৌলবাদী করে

উত্তর : অধিকাংশ সময়েই ধর্মমতের বিতর্ক ও বিশ্ব ঘটনাবলির বিষয়ে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী বারবার কঠিন ধর্ম বিশ্বাস ও মৌলবাদের সাথে মুসলমানদের উল্লেখ করা হচ্ছে। একই সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। এ বিষয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সীমাহীন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যেখানে তাদেরকে রূঢ় মানসিকতার বাহক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কোথাও বোমা

ফাটানো হলে আমেরিকান মিডিয়াগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের এ কাজের জন্য ইন্ধনদাতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অথচ অপরাধী ছিল এক আমেরিকান সৈন্য। এখন আমরা এসকল অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করব।

ঐ লোককে মৌলবাদী বলা হয়, যে নিজ বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা মূল কথাগুলোকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে। যদি কোনো ব্যক্তি ভালো ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং সেগুলোর ওপর ব্যবহারিক দক্ষতাও থাকতে হবে। যদি কেউ ভালো ব্যায়ামবীর হতে চায় তাকেও ব্যায়ামের মৌলিক বিষয় জানতে হবে। মতানুসারে, একজন ডাক্তারকে এবং একজন ব্যায়ামবীরকে নিজস্ব বিষয়ে মৌলবাদী (Fundamentalist) হতে হবে। ঠিক এরূপভাবে একজন বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ জানতে হবে এবং মতানুসারে তাকে বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলিতে মৌলবাদী হতে হবে। এরূপভাবে একজনকে দ্বীনি বিষয়েও মৌলবাদী হতে হবে।

মূলত সকল মৌলবাদী এক ধরনের নয় এবং সকল মৌলবাদীকে এক ধরনের সংজ্ঞার আলোকে বিচার করা যাবে না। মৌলবাদকে খারাপ বা ভালো এরূপ ভাগে ভাগ করা যাবে না। কারো মৌলবাদী হওয়া বিষয়টি নির্ভর করে সে কেমন বিষয়ের মৌলবাদী তার ওপর। একজন মৌলবাদী ডাকাত বা চোর নিজ পেশায় মৌলবাদী হয়, যিনি মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকেন। এ কারণে তাকে অপছন্দ করা হয়। বিপরীতে একজন (মৌলবাদী) ডাক্তার মানুষের জন্য যথেষ্ট কল্যাণকর এবং সম্মানেরই হয়ে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান, ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি জানি এবং তার ওপরে আমল করার জন্য সচেষ্ট। কোনো মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া লজ্জার কোনো বিষয় নয়। আমি মৌলবাদী মুসলমান। এজন্য আমি গৌরববোধ করি। কেননা আমি জানি ইসলামের মৌলিক নীতিমালা শুধু মানবতার জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের এমন কোনো মৌলিক নীতি নেই যা মানবতার কল্যাণ করে না বা যাতে কোনো ক্ষতিকর দিক আছে। অনেকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল মনোভাব পোষণ করে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের অনেক জ্ঞান সঠিক নয় এবং তা ইসলামের ভিত্তির ওপরেও নেই। ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে এ ধরনের অনুধাবনের সৃষ্টি। যদি কোনো ব্যক্তি উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানে, তাহলে এ সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না যে ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপকারী।

ওয়েবস্টার- এর ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী 'Fundamentalism' ছিল এমন এক আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান প্রোটেস্টান্টরা শুরু করে। এ আন্দোলন নতুনত্বের প্রতিবাদ ছিল এবং এ সকল লোকেরা বিশ্বাস ও আচরণের ভিত্তিতে নয় বরং ঐতিহাসিক রেকর্ডের ভিত্তিতে বাইবেলের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পবিত্রতার ওপর জোর দিতে থাকেন। তারা এও বলতে থাকেন যে, বাইবেলের মূলে বহু খোদার বাক্য আছে।

'মৌলবাদ' বা 'Fundamentalism' এমন এক পরিভাষা যা সর্বপ্রথম খ্রিস্টানদের এক দল সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় যারা বিশ্বাস করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি অক্ষর আল্লাহর বাণী এবং এর মধ্যে কোনো ঘাটতি বা ভুল নেই। কিন্তু অক্সফোর্ড ডিকশনারির সাম্প্রতিক সংস্করণ অনুযায়ী মৌলবাদ হলো কোনো বিশেষ ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামের মূল বা ভিত্তির ওপরে আমল করা। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এবং তাদের মিডিয়াগুলো মৌলবাদের অভিযোগ থেকে খ্রিস্টানদের অব্যাহতি দিতে মুসলমানদের ওপর বিশেষভাবে এ অভিযোগ চাপাচ্ছে। আজ 'Fundamentalism' বা মৌলবাদ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হওয়া মাত্রই ব্যবহারকারীর মনে তৎক্ষণাৎ এমন এক মুসলমানের চিত্র ভেসে ওঠে, যে এদের দৃষ্টিতে নিষ্ঠাবান। সকল মুসলমানেরই নিষ্ঠাবান হওয়া জরুরি। নিষ্ঠাবান এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে তার বিশ্বাস প্রচার করে।

আপনারা জানেন, ডাকাত পুলিশকে ভয় পায়। অন্য কথায়, পুলিশ ডাকাতের জন্য ভীতি উদ্রেককারী। এমনি করে সকল মুসলমানকে চোর-ডাকাত, ব্যভিচারী এবং সাধারণের শত্রুদের জন্য ভীতি উদ্রেককারী হতে হবে এবং এ ধরনের লোক যখন কোনো মুসলমানকে দেখবে তখন তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হবে। এটা বৈধ যে, এ শব্দ সাধারণভাবে এ ধরনের লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে যে ব্যক্তি সাধারণ লোকদের জন্য ভীতিপ্রদ। কিন্তু যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের জন্য একজন ভালো মুসলমান ভীতির কারণ হবে, তবে সাধারণ লোকদের জন্য নয়। একজন মুসলমান হবেন নিরপরাধ জনসাধারণের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতীক।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ শাসনামলে কিছু কিছু মুজাহিদ যারা ইংরেজদের প্রতি অনুগত ও সহযোগী ছিলেন না তাদেরকে ইংরেজরা বলতো সন্ত্রাসী। কিন্তু সাধারণ লোকজনের নিকট তারা ছিল জনগণ ও দেশের বন্ধু। এসকল লোকদের দু'রকমের নাম ছিল। যারা মনে করতো ইংরেজদের ভারতবর্ষ শাসন করার অধিকার ছিল, তাদের নিকট তারা ছিল সন্ত্রাসী। যারা মনে করতো ইংরেজদের ভারতবর্ষ শাসন করার কোনো অধিকার নেই তারা তাদেরকে বলতো

দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধা। এজন্য কোনো ব্যক্তির কোনো কর্মের ব্যাপারে ফায়সালা করার পূর্বে তার অবস্থান শোনাটা জরুরী। উভয় পক্ষের প্রমাণাদি শোনার পর সুরতহাল নিয়ে এবং ঐ ব্যক্তির দলিল ও উদ্দেশ্য দেখে তার সম্পর্কে রায় দেয়া যাবে।

'ইসলাম' শব্দটির উৎপত্তি 'সালাম' শব্দ থেকে। যার অর্থ শান্তি। এটা শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। যা অনুসারীদের দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা প্রদান করে। এ কারণে সকল মুসলিমের মৌলবাদী হওয়া অপরিহার্য। এই দ্বীন, যা নিরাপত্তার ধর্ম তার মূল ভিত্তির ওপর আমল করা অপরিহার্য এবং সে সমাজের শত্রুদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকারী হওয়াও অপরিহার্য। তাহলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায় ও ইনসাফের জয়-জয়কার থাকে।

প্রশ্ন : ইসলাম এক ব্যক্তিকে একের অধিক বিবাহ অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে কেন?

নারীর সম্মান ও মর্যাদার জন্য

উত্তর : 'Polygamy' বা বহুবিবাহের অর্থ এমন বৈবাহিক প্রথা যেখানে একজন ব্যক্তি অনেকের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে জীবনযাপন করবে। এটা দু 'প্রকার। প্রকারভেদগুলো হলো –

১. যেখানে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে;

২. যেখানে একজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করবে।

ইসলাম সীমিত সংখ্যক স্ত্রী রাখার অনুমতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু এক স্ত্রীকে একই সময়ে একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইসলাম একজন স্বামীকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি কেন দিল?

একমাত্র আল-কুরআনই হলো এমন ধর্মীয় গ্রন্থ যাতে বলা হয়েছে, এক স্ত্রী বিয়ে কর। দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্মীয় কিতাবে একথা বলা হয়নি যে শুধু এক স্ত্রী রাখতে হবে। তা সে হিন্দুদের বেদ, মহাভারত বা গীতাই হোক, কিংবা ইহুদিদের তালমূদ অথবা খ্রিস্টানদের বাইবেলই হোক না কেনো। এসব ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারে একজন পুরুষ যতো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে এবং এ প্রথাই প্রচলিত ছিল কিন্তু বহু শতাব্দী পরে হিন্দু পুরোহিত পণ্ডিতগণ এবং খ্রিস্টান পাদ্রিগণ স্ত্রীদের সংখ্যা একের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে বহু হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রমাণ আছে যাদের একাধিক স্ত্রী ছিল। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। এভাবে কৃষ্ণেরও ছিল বহু

স্ত্রী। প্রথম প্রথম খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের এ অনুমতি ছিল যে কেউ ইচ্ছা মতো সংখ্যক স্ত্রী রাখতে পারে। এজন্য বাইবেলে কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল না। মাত্র কয়েকশ বছর পূর্বে পাদ্রিগণ স্ত্রীদের সংখ্যা এক এ সীমাবদ্ধ করে দেন। ইহুদি ধর্মেও একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে। ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ তালমূদের কালবর্ণনা অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আ) এর তিন স্ত্রী এবং হযরত সুলাইমান (আ) এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন। একের অধিক স্ত্রীর অনুমতি গরশুম বিন ইহুদার রাজত্বকাল (৯৬০-১০৩০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তার এক আদেশের ভিত্তিতে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী সিফাদী ইহুদি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি ইহুদিদের প্রধান রাববী ('Chief Rablonate) একাধিক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন।

স্পষ্ট করে বলতে চাই, ১৯৭৫ সালে ভারতে পরিচালিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক বিবাহ করে। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ইসলামে নারীদের মুকাম কমিটির রিপোর্টের ৬৬ থেকে ৬৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সময়কালে হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহের শতকরা হার ৫.০৬% যেখানে মুসলমানদের বহুবিবাহের শতকরা হার ছিল ৪.৩১। ভারতীয় আইন অনুসারে মুসলমানদের একাধিক বিয়ে করা বৈধ। পক্ষান্তরে হিন্দুদের একাধিক বিয়ে সিদ্ধ নয়। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের মাঝে বহুবিবাহ মুসলমানদের চেয়ে বেশি। প্রথমে ভারতবর্ষে একাধিক স্ত্রী রাখার বিষয়ে কোনো আইন ছিল না। ১৯৪৫ সালে ভারতে বিবাহ আইন পাস হলে হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি হিসেবে বিবেচিত হয়। মনে রাখা দরকার যে, একথা আইনি বিধানে আছে, হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে নয়। আসুন আমরা দেখি ইসলাম কেনো একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে?

যেমন আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যাতে এক স্ত্রী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আল কুরআনের সূরা নিসার ৪ নং এবং ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে -

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ .

অর্থঃ তোমরা তোমাদের পছন্দমতো বিয়ে কর দুই, তিন অথবা চার জন।

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً .

অর্থ ঃ যদি তোমরা ভয় পাও যে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন।

কুরআন নাযিলের পূর্বে বিয়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না এবং অনেক পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত, এমনকি কারো কারো শত স্ত্রীও থাকত। কিন্তু ইসলাম স্ত্রীদের সংখ্যা চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দুই, তিন, অথবা চার স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত হলো ন্যায়বিচার করতে হবে। এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১২৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ـ

অর্থ : তোমরা কখনো একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, যদিও তোমরা তা করতে চাও।

এজন্য একাধিক বিয়ে কোনো নিয়ম নয়। বরং এটা ভিন্ন এক কথা। অনেকে একথা থেকে মনে করে যে এক মুসলমানের একাধিক বিয়ে হালাল। হালাল-হারামের দিক দিয়ে ইসলামের বিধান পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা -

১. **ফরজ :** এটা আবশ্যকীয় এবং পালনীয়। এটা আমল না করলে আযাব ও শাস্তি দেয়া হবে।

২. **মুস্তাহাব :** এর নির্দেশ আছে এবং এটা আমল করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. **মুবাহ :** বৈধ, এটা করার অনুমতি আছে। তবে করা না করা সমান।

৪. **মাকরূহ :** এটা বৈধ নয়, এর ওপর আমল করা অপছন্দনীয়।

৫. **হারাম :** এটাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এটা আমল করা নিষিদ্ধ এবং এ কাজ পরিত্যাগ করা সওয়াবের কাজ।

একের অধিক বিয়ে করার বিষয়টি এসকল বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ করার অনুমতি আছে, তবে বলা যাবে না যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী আছে সে তার চেয়ে উত্তম যার স্ত্রী মাত্র একজন। এটা আল্লাহর কুদরতি নিয়ম যে, নারী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। তবে একজন বালিকা একজন বালকের চেয়ে অধিক শক্তি রাখে। একজন বালিকা একজন বালকের চেয়ে অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে। এজন্য জন্মের শুরুতে মেয়েশিশুর চেয়ে ছেলেশিশুর মৃত্যু অধিক। তদ্রূপ যুদ্ধে নারীর চেয়ে অধিক হারে পুরুষ মৃত্যুবরণ করে। দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধির কারণে নারীর চেয়ে অধিক হারে মৃত্যুবরণ করে পুরুষ। নারীদের গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে বেশি আবার বিপত্নীক স্বামীদের চেয়ে বিধবা স্ত্রীদের সংখ্যা অধিক। ভারত এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এসকল দেশের মধ্যে পড়ে যে দেশগুলোতে নারীদের

সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। এর কারণ হলো অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা। ভারতে নারী শিশুদের অনেককে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই ইচ্ছাধীনভাবে হত্যা করা হয়। মূলত এখানে লাখ লাখ নারী গর্ভবতী অবস্থায় ডাক্তারি পরীক্ষায় কন্যা শিশুর ভ্রূণ চিহ্নিত করে হত্যা করে। এজন্য প্রতি বছর দশ লাখের অধিক কন্যা শিশুকে মেরে ফেলা হয়। এ ধরনের অপকর্ম বন্ধ করা হলে ভারতেও নারীদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়ে যেত।

আমেরিকায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৭৮ লাখের মতো বেশি। কেবল নিউইয়র্কেই নারীদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি ১০ লাখ এবং এ তথ্য সেখানকারই লিঙ্গ ভিত্তিক জনসংখ্যা বিভাজনের এক পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত। আমেরিকায় সমকামি লোকের সংখ্যা মোট আড়াই কোটি। এসব লোকের নারীদের বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই নেই। এরূপ অবস্থা বৃটেনেও। সেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি ৪০ লাখ। জার্মানিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৫০ লাখ বেশি। রাশিয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি ৯০ লাখ।

আসল সংখ্যা তো আল্লাহই ভালো জানেন। যদি একজন পুরুষ একজন করে নারীকে বিয়ে করে, তাহলে আমেরিকাতে ৩ কোটি নারী অবিবাহিত থাকবে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, আড়াই কোটি লোক আমেরিকাতে সমকামী। একইভাবে বৃটেনে ৪০ লাখ, জার্মানিতে ৫০ লাখ, রাশিয়াতে ৯০ লাখ নারীর কোনো স্বামী মিলবে না। ধরুন, আমার বোন আমেরিকায় থাকে এবং সে অবিবাহিত নারীদের একজন। আবশ্যকীয়ভাবে আপনার বোনও ওখানে থাকতে পারে। এদের জন্য দুটি পরিস্থিতির মধ্যে একটি সমাধান বেছে নিতে হবে- ১. হয়তো সে এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে বসবে যার পূর্বে থেকে স্ত্রী আছে, অথবা ২. তাকে পাবলিক প্রপার্টি বা বেশ্যা হয়ে যেতে হবে। এ দু'পথের বাইরে কোনো পথ নেই। যে নারীর কল্যাণময় গুণ আছে সে অবশ্যই প্রথম পথ অবলম্বন করবে। অনেক নারী স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীর সঙ্গ সহ্য করে না। কিন্তু যদি সমাজের অবস্থা এতোদূর নাজুক ও সঙ্কটময় হয় তখন একজন ঈমানদার নারী এধরনের ক্ষতি স্বীকার করে নেবেন এবং তিনি চাইবেন না যে তারই বোনেরা পাবলিক প্রপার্টি বা পতিতা হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : পর্দায় আবদ্ধ রেখে ইসলাম কি নারীদের খাটো করেনি?

পর্দা নারীদের মর্যাদা বাড়িয়েছে

উত্তর : অধিকাংশ সময় ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়াগুলোতে ইসলামে নারীদের মর্যাদাকে খাটো করার টার্গেট বানায়। পর্দা অর্থাৎ ইসলামি পোশাকের ব্যাপারে বলা হয় যে, নারীরা ইসলামি শরিআতের দ্বারা নির্যাতিত এবং তাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা ইসলামে পর্দার বিষয়টা পরে বিশ্লেষণ করব। ইসলাম-পূর্ব যুগের নারীর মর্যাদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিই। ইতিহাস সাক্ষ যে, ইসলাম-পূর্ব সংস্কৃতিগুলোতে নারীর কোনো অবস্থান ছিল না। এদেরকে শুধুই যৌন সম্ভোগের মাধ্যম মনে করা হতো। এমনকি এদেরকে মানবকুলের সদস্যের মর্যাদা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করা হতো না।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় বাবেলের সংস্কৃতিতে নারীদের ঘৃণিত মনে করা হতো এবং তাদের আইনে নারীরা ছিল সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত। যদি কোনো পুরুষ কাউকে হত্যা করতো তাহলে তার শাস্তির সাথে সাথে স্ত্রীকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

গ্রিক সংস্কৃতি যাকে প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ও মর্যাদাবান মনে করা হয়; সেখানেও নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল সকল অধিকার থেকে এবং এভাবেই তাদেরকে তুচ্ছ মনে করা হতো। গ্রিক দেবীদের তালিকায় এক খেয়ালি নারী ছিল যাকে 'প্যান্ডোরা' বলা হতো, তাকে মানুষের দুর্ভাগ্যের মূল মনে করা হতো। এ সভ্যতার লোকজন নারীদেরকে পুরুষের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতো। একথা ঠিক যে, সনাতন ধর্মেও নারীদের অনেক মর্যাদাবান মনে করা হতো এবং এ ব্যাপারে তারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করতো। পরবর্তীতে এ সংস্কৃতিতেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও জাতিভেদ শুরু হয় এবং এদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

রোমান সংস্কৃতির উৎকর্ষের যুগে একজন পুরুষের তার স্ত্রীকে হত্যা করার অধিকার ছিল। বৈষম্য ও উলঙ্গপনা ছিল এ সভ্যতায় সাধারণ ব্যাপার।

মিসরীয় সভ্যতায় নারীদেহকে তুচ্ছ মনে করা হতো এবং তাদেরকে মনে করা হতো শয়তানের আলামত। ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীদের খুবই হেয় করা হতো এবং সাধারণত কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াটাকে পিতা ও বংশের জন্য এতোই অমর্যাদাকর মনে করা হতো যে, তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো।

ইসলাম নারীদের সমমর্যাদা দান করেছে এবং ১৪০০ বছর পূর্বে তাদের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নারীকে তার মর্যাদায়

আসীন করা হয়েছে। সাধারণত মনে করা হয় পর্দা শুধু নারীদের জন্য অথচ কুরআন মাজীদে পর্দার প্রথম নির্দেশ পুরুষের জন্যই দিয়েছে। যেমন ২৪ নং সূরা নূর এর ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি মুমিন (পুরুষদের) বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

এ আয়াতের আলোকে যখন কোনো পুরুষ কোনো গায়রে মাহরাম নারীর ওপর দৃষ্টি দিবে তখনই দৃষ্টিকে নামিয়ে নিবে। এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফাজত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করে না বেড়ায়। তবে শরীরের যে অংশ এমনিতেই খোলা থাকে সেগুলোর কথা আলাদা। তারা যেন তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর আগের ঘরের ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইপো, তাদের বোনপো, তাদের নিজেদের মহিলা, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী, নিজেদের অধিকারভুক্ত এমন পুরুষ যাদের মহিলাদের নিকট থেকে কোন কিছুই কামনার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা মহিলাদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না এদের ছাড়া কারো কাছে যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। আলোচ্য আয়াতে পর্দার ছয়টি শর্ত ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে শর্তগুলো ক্রমানুসারে উপস্থাপন করছি–

শর্ত-১. পুরুষেরা নিজ নাভী থেকে পায়ের গোড়ালির সন্ধি (টাখনু) পর্যন্ত ঢেকে রাখার মতো পোশাক পরবে। নারীদের শরীর ঢেকে রাখবে। যদি হাত ও চেহারা ঢেকে রাখে তাহলে আরো ভালো। তবে এটা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। সারা শরীর আবৃত রাখা বাধ্যতামূলক। শুধু হাতের কব্জি পর্যন্ত ও চেহারা দেখা যাবে তবে দেখার শর্ত পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন।

শর্ত-২. সে এমন পোশাক পরতে পারবে না যাতে শরীরের গোপন কোন অঙ্গ চোখে পড়ে।

শর্ত-৩. এমন আঁটসাঁট পোশাক পরতে পারবে না যা দ্বারা অঙ্গের ভাঁজগুলো চোখে পড়ে।

শর্ত-৪. সে এমন কাপড় পরতে পারবে না যা দ্বারা বিপরীত লিঙ্গ আকৃষ্ট হয়।

শর্ত-৫. এমন পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত এবং তাদের সাথে মিল থাকে। যেমন পুরুষের ছায়া, ব্লাউজ অথবা শাড়ি পরা।

শর্ত-৬. এমন পোশাক পরা যাবে না যাতে বিধর্মী বা কাফির মনে হয়। (যেমন ঃ পৈতা পরা, সিঁদুর লাগানো ইত্যাদি।)

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করা যাক, ইসলাম পর্দা এবং বিপরীত জাতির পার্থক্যের মধ্যে বিশ্বাস করে কেন? আমরা দেখি যে, মুসলিম সমাজ পর্দাপ্রথার সমর্থন করে আবার কোন সমাজ পর্দার বিরোধিতা করে। আমেরিকা এমন এক রাষ্ট্র যেখানে সবচেয়ে বেশি অপরাধ সংগঠিত হয়। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত এফবিআই-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে ১ বছরে ১০ হাজার ২৫৫ নারী ধর্ষিতা হয়েছে। এ পরিসংখ্যান কেবল দায়েরকৃত মামলার। অন্য রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এটা সংঘটিত ঘটনার শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র। সঠিক চিত্র পেতে হলে আপনাকে ১০, ২৫৫-কে ৬.২৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। দেখবেন শুধু ১৯৯০ সালে ৬, ৪০, ০০০ নারী ধর্ষিতা হয়েছে। বছরের দিনগুলো দিয়ে আপনি এ সংখ্যাকে ভাগ করলে দেখবেন প্রতিদিন ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১,৭৫৬ টি। ১৯৯১ সালে প্রতিদিন ১৯০০ নারী ধর্ষিতা হয়েছে এবং ১৯৯৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ১.৩ মিনিটে একটি ধর্ষণের মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। আপনার কাছে এ প্রশ্নের জবাব আছে কি, কেন আমেরিকাতে নারীদের অধিকার বেশি প্রদান করা হয়েছে এবং সেখানে নারী ধর্ষণও বেশি হয় এবং এসকল ঘটনার শতকরা ১৬ ভাগ অভিযোগের মামলা নথিবদ্ধ হয়, মাত্র শতকরা ১০ ভাগের শাস্তি হয়। অর্থাৎ মাত্র

১.৬% এর লঘু শাস্তি হয় বা জেলে যায়। সকল অভিযোগে মাত্র ০.৮% -এর মামলা নথিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ কোনো লোক যদি ১২৫ বার ধর্ষণ করে তাহলে তার একবার মাত্র জেলে যেতে হয়। আমেরিকান আইনে ধর্ষণের শাস্তি জেল প্রদান, তবে তারা ধরে নেয় যে সে প্রথমবার ধর্ষণ করেছে এবং গ্রেফতার হয়েছে। তাকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয় এবং মাত্র এক বছরের শাস্তি দেয়া হয়।

ভারতেও ১৯৯২ সালে ১ ডিসেম্বরের প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর (এনসিবি) এক রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রতি ৫৪ মিনিটে ভারতে ১টি মামলা দায়ের হয়। প্রতি ২৬ মিনিটে উত্যক্ত করার মামলা, ১ ঘন্টা ৪৩ মিনিটে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যদি আপনি এ দেশের সকল ঘটনাকে সামষ্টিকভাবে বিবেচনা করেন তাহলে প্রতি ২ মিনিটে একটা ব্যভিচারের মামলা পাওয়া যাবে। যদি আপনি আমেরিকার সকল নারীকে হিজাব পরতে বলেন, তাহলে এসকল ঘটনা বাড়বে না কমবে?

প্রশ্ন : ইলামের দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান হওয়া কি যথার্থ?

অবস্থা ও পাত্রভেদে যথার্থ

উত্তর : ইসলামে সকল ক্ষেত্রেই দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান নয়। এটার ব্যতীক্রম আছে। কুরআন মাজীদে তিন স্থানে নারী-পুরুষের বিভেদ না করে সাক্ষ্য প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

উত্তরাধিকার প্রশ্নে ওসিয়াতের সময় দু'জন ন্যায়বিচারক লোকের সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন। যেমন, সূরা মায়িদার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় এসে উপনীত হয়, ওসিয়ত করার এ মুহূর্তে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময়ে তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তাহলে বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দুজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে।

তালাকের ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানানোর নির্দেশ আছে। সূরা তালাকের ২ নং আয়াতে আল্লাহ আমাদের জন্য দিক-নির্দেশনা দান করেছেন–

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ .

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে। তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যই এ সাক্ষ্য প্রদান করবে।

তবে সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের ব্যাপারে ফায়সালা করতে হলে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে।

যেমন, সূরা নূর-এর ৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

অর্থ ঃ যারা (খামাখা) সতী-সাধ্বী নারীদের ওপর (ব্যাভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী আনতে পারে না, তাদেরকে আশিটি দোররা মারো, আর তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না, এরাই অপকর্মকারী।

তাহলে একথা সঠিক নয় যে, দু'মহিলার সাক্ষ্য সব সময় এক পুরুষের সমান। এটা শুধু বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে প্রযোজ্য। কুরআন শরীফে এধরনের পাঁচটি আয়াত আছে যাতে নারী-পুরুষের সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে– দুটি নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। এটা বলা হয়েছে সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে। এ আয়াতটি সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় আয়াত। আয়াতটি হলো–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ـ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ـ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ـ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا . فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ـ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ . فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى .

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি কর তখন অবশ্যই তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার যেকোন একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দিবে যাকে আল্লাহ

তাআলা লেখা শিখিয়েছেন, তাদের কখনো লেখার কাজে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়। ঋণ গ্রহীতা লেখককে বলে দিবে কী শর্ত সেখানে লিখতে হবে। এ বিষয়ে যদি ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ ও মুর্খ হয় এবং সব দিক থেকে দুর্বল অথবা (শর্তাবলি) বলে দেবার ক্ষমতাই সে না রাখে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো ওলী ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে কী কথা লিখতে হবে। আরো দুজন পুরুষকে এ চুক্তিনামায় সাক্ষী বানিয়ে নিও। যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয়জন মনে করিয়ে দিতে পারে।

কুরআনে কারীমে এ আয়াত শুধু সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা হয়েছে। ঐ প্রকারের লেনদেনের সময়, এ চুক্তিনামা দুই পক্ষের মধ্যে লিখিত হবে। এজন্য দুজন সাক্ষী নিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন শুধু পুরুষই হয়, যদি পুরুষ না পাওয়া যায় এ অবস্থায় একজন পুরুষ ও দুজন নারী যথেষ্ট।

ইসলামে সম্পদের লেনদেনের সময় দুজন পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ সাধারণত পুরুষেরাই বংশীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষ অধিক ধী-সম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে যদি একজন নারী ভুলে যায়, অথবা ভুল করে তাহলে দ্বিতীয় জন মনে করিয়ে দেবে। কুরআনে ব্যবহৃত تَضِلَّ শব্দের অর্থ ইচ্ছাকৃত ভুল করা অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া। শুধু সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা বিবেচনায় এনে কিছু লোক একথা বলে যে, হত্যার বিচারের ক্ষেত্রেও নারীর সাক্ষ্য দ্বিগুণ করতে হবে অর্থাৎ দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান হবে। এ ধরনের কাজে পুরুষের তুলনায় একজন নারী বেশি ভীতু হয় এবং সে নিজের আবেগী অবস্থার কারণে অস্থির থাকে। এজন্য অনেক বিশেষজ্ঞের মতে হত্যার বিচারের মতো কাজে দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। কিছু কিছু আলেমের মতে, সকল ক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। এ ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারেননি। কারণ সূরা আন-নূরের ৬ থেকে ৯ নং আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। যেমন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ـ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

অর্থ ঃ যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোনো সাক্ষী না থাকে। তারা আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, অবশ্যই সে সত্যবাদী। পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার ওপর যেন আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হয়। স্ত্রীর ওপর থেকে এ ধরনের আনিত অভিযোগের শাস্তি রহিত করা হবে যদি সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, এই পুরুষ লোক আসলেই মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার বলবে, পুরুষটি সত্যবাদী হলে আল্লাহর গযব যেন তার ওপর নেমে আসে।

নবী করীম (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) কম-বেশি ২ হাজার ২১০ টির কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা তার একার সাক্ষ্যের ওপরে ভিত্তি করে সনদভুক্ত হয়েছে। এটা একথা প্রমাণ করে যে, একজন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। অনেক আলিম এ বিষয়ে একমত যে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আপনি ভেবে দেখুন, রোযা ইসলামের মৌলিক ইবাদতের একটি এবং এ ব্যাপারেও একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং তার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে গোটা মুসলিম সমাজ রোযা পালন করবে। আলিমদের মতে রোযা শুরু করার জন্য একজন এবং শেষ করার জন্য দু'জনের সাক্ষ্য আবশ্যক এবং এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যে সে সাক্ষী পুরুষ কিংবা নারী হোক। কিছু এমন বিষয়ও রয়েছে যেখানে শুধু একজন নারীর সাক্ষ্যই জরুরি, যেমন–নারীদের মাসআলার ব্যাপারে, মহিলাদের দাফনের জন্য গোসল দেয়া, এ ধরনের বিষয়ে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের যে পার্থক্য করা হয়েছে তা অসমতার ভিত্তিতে নয় বরং সমাজে তাদের দায়িত্বের পার্থক্যের কারণে। যে দায়িত্ব ইসলাম উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলামে কেনো উত্তরাধিকারে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক করা হয়েছে?

নারীর আছে অবস্থানগত সুবিধা

উত্তর : কুরআন মাজীদে এমন অনেক আয়াত আছে যাতে উত্তরাধিকার বন্টনের ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৮০ ও ২৪০; সূরা নিসা, আয়াত নং ৭, ৮, ১১ ও ৩৩; সূরা মায়িদা, আয়াত নং ১০৬ থেকে ১০৮।

কুরআন মাজীদের ৩টি আয়াতে নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকারের অংশ পরিষ্কারভাবে

বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকারে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের জন্য বিধান জারি করেছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো। কিন্তু কন্যারা যদি দুয়ের অধিক হয় তাহলে তাদের জন্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর কন্যা যদি একজন হয় তাহলে তার অংশ হবে অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রত্যেকের জন্য থাকবে ছয় ভাগের একভাগ, মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতা থাকে তাহলে মায়ের অংশ হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোন ভাই-বোন বেঁচে থাকে তাহলে তার মায়ের অংশ হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, তার ওসিয়ত পূরণ ও ঋণ আদায়ের পরই এসকল ভাগ হবে। তোমরা জানো না তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনিই হচ্ছেন মঙ্গলময়।

তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তান-সন্ততি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের একভাগ। তাদের কৃত অসিয়ত পূরণ ও ঋণ

পরিশোধের পর। তোমাদের স্ত্রীদের জন্য তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, ওসিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা-মাতাও নেই, তার শুধু এক ভাই এক বোন আছে, তাহলে তাদের সবার জন্য থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, তারা যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সকলে মিলে পাবে এক-তৃতীয়াংশ, মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়াই। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

সূরা নিসা'র ১৭৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেন–

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۔

অর্থ ঃ (হে নবী!) তারা আপনার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির (উত্তরাধিকারের) ব্যাপারে তোমাদের তার সিদ্ধান্ত অবহিত করছেন। যার পিতা-মাতা কেউ-ই নেই আবার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, এ ধরনের কোনো সন্তানহীন ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে বোনটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হবে। অপরদিকে সে যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে সে তার বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যদি তারা দু' জন হয় তাহলে তার দুই বোন সেই সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগের মালিক হবে। যদি ভাই-বোনেরা কয়েকজন হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরুষের দুই ভাগ। আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকারের এ আইন-কানুনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্য বলে দিয়েছেন যাতে তোমরা (কোনরূপ) বিভ্রান্ত হয়ে না পড়, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

বেশিরভাগ নারীদের অংশ পুরুষের অর্ধেক তবে সবক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য নয়। যদি মৃতের পিতা-মাতা ও সন্তানাদি না থাকে কিন্তু মায়ের পক্ষ থেকে ভাই-বোন থাকে তাহলে উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ লাভ করবে। কয়েকটি

ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। যদি মৃতা স্ত্রী হয় এবং তার সন্তান এবং ভাই-বোন না থাকে এবং তার স্বামী এবং মা-বাবা থাকে তবে স্বামীকে অর্ধেক এবং মাকে চার ভাগের এক ভাগ অংশে এবং পিতাকে ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ দিতে হবে। এ অবস্থায় মায়ের অংশ পিতার দ্বিগুণ। এ কথা ঠিক যে, সাধারণভাবে নারীরা পুরুষের তুলনায় অর্ধেক অংশ পায়। যেমন কন্যার অংশ অর্ধেক। স্ত্রীদের আট ভাগের এক অংশ যেখানে স্বামীদের চার ভাগের এক অংশ। মৃতের সন্তান না থাকলে স্ত্রীর আট ভাগের এক অংশ এবং স্বামীর দুই ভাগের এক অংশ অর্থাৎ অর্ধেক। যদি মৃতার সন্তান না থাকে এবং মৃতের পিতা-মাতা বা সন্তান না থাকে তাহলে বোন ভাইয়ের অর্ধেক অংশ লাভ করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের তুলনায় অর্ধেক তবে যখন তাকে স্ত্রী এবং কন্যার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু এর উত্তর হলো যে, যেহেতু পুরুষের ওপর বংশ রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই পুরুষের ওপর যাতে অবিচার না হয় সে কারণে আল্লাহ নারীর তুলনায় পুরুষকে বড় অংশ প্রদান করেছেন।

আমি এখানে একটি উদাহরণ দিতে চাই। এক লোকের মৃত্যুর পর তার সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছে। তার দু'সন্তান ছিল। এক ছেলে ও এক মেয়ে। দু'জনের দেড় লাখ রুপি। ইসলামি আইন অনুসারে ছেলে পেল এক লাখ রুপি এবং মেয়ে ৫০ হাজার রুপি। কিন্তু ছেলে যে এক লাখ রুপী পেল তার অধিকাংশ নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য খরচ করতে হলো। এক্ষেত্রে সম্ভবত ৮০ হাজার, ৮৫ হাজার অথবা এক লাখ রুপি তাকে ব্যয় করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই বোন যে ৫০ হাজার রুপি পেল তার পারিবারিক ব্যয় বাবদ এক পয়সাও খরচ করার প্রয়োজন হয় না। যে এক লাখ রুপি নিল তার পরিবারের জন্য ৮০ হাজার বা তার চেয়ে অধিক খরচ হয়ে গেল। অথচ যিনি (বোন) ৫০ হাজার পেলেন তার নিকট সারা জীবন তা থেকে যাবে।

প্রশ্ন : ইসলামে মদ হারাম করা হয়েছে কেনো?

মাদক মানবসভ্যতার জন্য হুমকি

উত্তর : সুদূর অতীত থেকে মদ মানবসমাজের জন্য বিপদ ও হয়রানির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। আজো সারা পৃথিবীর বহুলোক এ পাপের কবলে পড়ে এবং লাখ লাখ লোক এর কারণে নানা ধরনের সমস্যার শিকার হন। সমাজের বহু সমস্যার মূলে রয়েছে মদ বা মাদকদ্রব্য। এর ব্যবহারে অপরাধ বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কে রোগ হয় এবং বহু পরিবার ভেঙ্গে যায়। আল-কুরআনে সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে রাখো মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর তাহলে তোমরা সফল হবে।

বাইবেলেও মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- মদ হলো একটি ধোঁকাবাজ পানীয়। যে এটা গ্রহণ করে, তাকে সে উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ে। বলা হয়েছে- মদের নেশায় নিমগ্ন হয়ো না।

মানুষের মনকে মন্দ কাজ থেকে ফেরানোর একটি পন্থা আছে যাকে বলে 'নফসে লাওয়ামা'। এটা মানুষকে ভুল (নিষিদ্ধ) কাজ থেকে বিরত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ একজন লোক মাতা-পিতা এবং বড়দের সঙ্গে কথা বলার সময় ভুল বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে না। এক ইভাবে যখন তার পায়খানা প্রশ্রাবের চাপ আসে তখন সাধারণত তা চাপিয়ে রাখে এবং টয়লেটে চলে যায় এবং সেখান থেকে পৃথক হয়ে প্রয়োজন পূর্ণ করে পবিত্র হয়। মদ পান করলে মানুষের স্বভাবগত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায় এবং সে স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করে। সে মদের নেশায় আবোল তাবোল এবং অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু এতে তার অনুভূতি হচ্ছে না যে, সে তার পিতা-মাতাকেও গালাগাল দিচ্ছে। বেশির ভাগ মদ্যপ নিজ পোশাকেই পেশাব করে দেয়। সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। স্বাভাবিকভাবে চলতেও পারে না। কথাও বলতে পারে না। এমনকি মার-পিট করলেও স্বাভাবিক হয় না।

আমেরিকার বিচার বিভাগের এফ জেন্ট-এর এক ব্যুরো রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে আমেরিকায় দৈনিক ২ হাজার ৭১৩টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে যে, এ ধর্ষকদের অধিকাংশ ছিল নেশাগ্রস্ত। পরিসংখ্যানে এ তথ্যও পাওয়া গেছে যে, ৮% আমেরিকান রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় মহিলাদের সাথে যৌন আচরণ করে। অন্য কথায়, প্রত্যেক ১২ জনের মধ্যে একজন এ ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত। এসকল ঘটনার অধিকাংশই একজন অথবা উভয়ের নেশাগ্রস্ততার মধ্যে ঘটে। মরণব্যাধি এইডস-এর ছড়িয়ে পড়ার এক বড় কারণ হলো নেশা।

বহুলোক একথা বলে যে, সে অনিয়মিত মদ্যপ অর্থাৎ কখনো কখনো সুযোগ পেলে মদ পান করে। সে আরো বলে সে নেশায় বুদ হয়ে যায় না, দু'এক পেগ

পান করে মাত্র এবং তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে এবং তার নেশা হয় না। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শুরুতে সকলে হালকা ও অস্থায়ী মদ্যপ হয়। একজনও একথা চিন্তা করে মদপান শুরু করে না যে সে প্রতিদিন মদপান করবে। কোনো কোনো অনিয়মিত মদ্যপ এটাও বলে যে, আমি কয়েক বছর যাবত মদ পান করছি এবং আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখি। আমার একবারও নেশা হয়নি। ধরুন, একজন অনিয়মিত মদ্যপ যদি মাত্র একবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালো এবং সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধর্ষণ করল অথবা নিজের কোনো রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়াকে ধর্ষণ করে বসল। পরবর্তীকালে এ অনুভূতি তার সারা জীবন থাকবে। ধর্ষণ এবং এর শিকার নারীর এতো বড় ক্ষতি হয় যে, তার যাচাই অসম্ভব।

সুনানে ইবনে মাজার 'পান অধ্যায়' এর বাবু খমর (মদ অধ্যায়) হাদীস নং ৩,৩৭১ -এ মদ্যপান হারাম হবার বিষয়টি আছে। নবী করীম (স) বলেছেন, 'মদ পান করো না, নিঃসন্দেহে এটি সকল অপরাধের চাবি (মূল) ৩৯২ নং হাদীসে বলা হয়েছে- সকলনেশা এবং নেশাদ্রব্য হারাম। সামান্য পরিমাণ নেশার উদ্রেক করলে সামান্য পরিমাণও হারাম।

অর্থাৎ নেশা এক ঢোক বা এক চামচও হারাম। যে ব্যক্তি মদ্যপান করে তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ এবং ঐ সকল লোকের ওপরও আল্লাহর অভিশাপ যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদ ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে যুক্ত। সুনানে ইবনে মাজার হযরত আনাস (রা) -এর বর্ণিত (৩৩৮০) হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মদের ওপর দশ ধরনের অভিশাপ দিয়েছেন। তাহলো-

১. মদ সঞ্চয়কারী; ২. মদ প্রস্তুতকারক;
৩. যার জন্য মদ প্রস্তুত করা হয়; ৪. মদ বিক্রেতা;
৫. যে মদ ক্রেতা ; ৬. মদের জন্য গমনকারী
৭. যার নিকট মদ নিয়ে যাওয়া হয়; ৮. মদের মূল্য আদায়কারী
৯. মদ পানকারী ১০. মদ পরিবেশনকারী।

মদ এবং যাবতীয় নেশাদ্রব্য ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার বহু বৈজ্ঞা[illegible]রণ বিদ্যমান। বিশ্বে মদ্যপানের কারণে বহু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবছর মদ্যপানের কারণে লাখ লাখ লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আমি এর সকল পরিসংখ্যান একত্র করতে চাই না। তবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করতে চাই-

- পাকস্থলীর ক্যান্সার একটি সাধারণ রোগ যা মদের কারণে হয়ে থাকে।
- পাকস্থলীর অন্ত্রের ক্যান্সার এবং বৃহৎ অন্ত্রের ক্যান্সার।

- Cardiomyopatry অর্থাৎ হৃদযন্ত্রে এর প্রভাব পড়ে রক্তচাপ থাকে এবং Coronary Artherosclerosis অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের শিরাগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
- মগজের হ্রাস-স্ফীতির মাধ্যমে এর কার্যক্ষমতাকে বিঘ্নিত করে এবং বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কের রোগ, যেমন– Cortical Peripheral, Neuropathy, Cerebellar Atrophy, Atrophy এগুলোর বেশিরভাগ হয় মদ্যপানের কারণে।
- স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
- মদ পানের কারণে বেরিবেরি রোগ এবং দন্ত সম্পর্কীয় সকল রোগ হয়।
- বারবার মদপানের কারণে ডিলিরিম রিমিনসও হয়। এটি এক ধরনের মারাত্মক রোগ। অপারেশনের পরে এ রোগ দেখা দেয় অনেক সময় এটা অকাল মৃত্যু ঘটায়। এর লক্ষণ হলো মেধার কমতি, ভীতি, ঘাবড়ানো ও চিন্তা করা।
- এরো কারায়েন গজ রোগ, যেমন Myoxodema, Florid Cushing Hyperthyroidism ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে হয়।
- রক্ত প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, এর কারণে Myclrocytic Anemia, ইত্যাদি মদ্যপান ও নেশাগ্রস্ততা থেকে জন্ম নেয়।
- রক্তের শ্বেত কণিকার স্বল্পতা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাবলি দেখা দেয়।
- সাধারণ ব্যবহার্য ওষুধ মেট্রোনিডাজল (ফ্লাজিল) মদের সাথে খুবই মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত মদপানের কারণে শরীরের ইনফেকশন বারবার প্রভাবিত হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়।
- সীনার ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের প্রদাহ, এজমা এবং ফুসফুসের টি/বি, (যক্ষা), মদের করণে সৃষ্ট সাধারণ রোগ।
- মদখোর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রায় সময় বমি করে। এছাড়া তার শ্বাসনালী ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাওয়ার কারণে সাধারণত বমি ফুসফুসের মধ্যে চলে যায়, ফলে নিউমোনিয়া এবং ফুসফুসের ক্ষতি হয় এবং অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।
- মহিলাদের মধ্যে মদের বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। পুরুষের তুলনায় মদ্যপ নারীর হার্টবিট বেশি হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের বাচ্চার ওপর এ প্রভাব হয় গুরুতর।

- মদ্যপানের কারণে চর্মরোগও হয়। চর্মরোগগুলোর মধ্যে Atopecia অর্থাৎ গাঞ্জাপন, নখের কুনিভাঙ্গা, নখের ইনফেকশন ইত্যাদি মদপানের কারণে হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে ডাক্তাররা মদের ব্যাপারে উদার চিন্তা করে এবং মদকে রোগের চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসলামিক রিসার্চ ফাউণ্ডেশন একটি পোস্টার প্রচার করে। যাতে একথা বলা হয় যে মদপান কোন রোগ না হলেও তা অনেক রোগের প্রধান কারণ। কিন্তু তারপরও–

ক. বোতলজাত মদ দেদারছে বিক্রি করা হচ্ছে।
খ. এর প্রসারের জন্য রেডিও টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।
গ. এর প্রচারের লাইসেন্স দেয়া হয়।
ঘ. এটাকে রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

অথচ এটি–

১. বড় বড় শহরে ভয়ানক দুর্ঘটনা ও অকাল মৃত্যু ঘটায়।
২. পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে এবং অপরাধের মাত্রা বাড়ায়।
৩. জীবাণু ও ভাইরাস ব্যতীতই মানুষদের ধ্বংসের কারণ হয়।

অতএব মদ কেবল একটি রোগই নয় বরং এটা শয়তানের মারাত্মক হাতিয়ার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সীমাহীন প্রজ্ঞার কারণে আমাদেরকে শয়তানের জাল থেকে বাঁচার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন। এটা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। এর যে ধরনের বিধান আছে তা মানুষের মূল ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার জন্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু মদ মানুষের সমাজের স্বাভাবিক গতিধারা থেকে পৃথক করে দেয়। এটা মানুষকে পশুর চেয়েও নিচে নামিয়ে দেয়; যদিও সে আশরাফুল মাখলুকাত হবার দাবি করে। এ সকল কারণে মদকে হারাম করা হয়েছে।

প্রশ্ন : কেনো শূকরের গোশত ইসলামে নিষিদ্ধ?

শূকরের গোশত সব ধর্মেই নিষিদ্ধ

উত্তর : ইসলামে শূকরের গোশত হারাম বা নিষিদ্ধ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। আল কুরআনে শূকরের গোশত খাওয়ার ব্যাপারে কম-বেশি চার স্থানে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন– সূরা বাকারার আয়াত নং ১৩৭; সূরা মায়িদার আয়াত নং ০৩; সূরা আনআম-এর আয়াত নং ১৪৫ এবং সূরা নাহল-এর আয়াত নং ১১৫ ও সূরা

মায়িদার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ـ

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে মৃত জিনিস, রক্ত ও শূকরের গোশত।

খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের লেভিটিকাস-এ বলা হয়েছে—

এবং শূকর খেও না। কেননা এর পা খণ্ডিত এবং পৃথক, অবস্থা এই যে, তা পরিষ্কার থাকে না। তা তোমাদের জন্য নাপাক, তোমরা তার গোশত ভক্ষণ কর না, এবং তার লাশের ওপর হাত লাগিও না, কেননা তা তোমাদের জন্য নাপাক।

এভাবে বাইবেলের এস্তেনোমীতে শূকর ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে—

এবং শূকর তোমাদের জন্য এ কারণে নাপাক যে, এর পা বিচ্ছিন্ন কিন্তু সে পরিষ্কার হয় না। তোমরা এর গোশত খেও না এবং এর লাশ স্পর্শও কর না।

এরূপভাবে বাইবেলের ইসাইয়া গ্রন্থের অধ্যায় ৬৫; শ্লোক নম্বর ২ থেকে ৫ পর্যন্ত শূকরের গোশতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অন্যান্য অ-মুসলিম এবং আল্লাহকে অমান্যকারীদের তুষ্ট করার জন্য তাদের সামনে আমি জ্ঞানভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলব যে, শূকরের গোশত বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৭০ প্রকারের রোগ-ব্যাধির জন্ম দেয়।

যারা এটা খায় তাদের পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে কয়েক প্রকারের জীবাণু জন্ম লাভ করে, যেমন ওয়াভওয়ার্ম, পেন ওয়ার্ম, হুক ওয়ার্ম ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক Taenia Solutm (তেইনিয়া সুলিয়াম) যাকে সাধারণভাবে 'কাদু দানা' বলা হয়। এটা অন্ত্রে থাকে এবং অনেক লম্বা হয়। এদের ডিম্বাণু রক্তে মিশে শরীরের প্রায় সকল অঙ্গে পৌঁছে যায় এবং যদি তা মগজের মধ্যে পৌঁছে তাহলে স্মৃতির ওপর প্রভাব পড়ে। যদি হার্টে পৌঁছে তাহলে হার্ট এ্যাটাক হতে পারে। যদি চোখে চলে যায়, তাহলে নাবিনাপেন জন্মগ্রহণ করে। যদি এটা পেটে পৌঁছায় তাহলে পেটের ক্ষতির কারণ হয় এবং এটা শরীরের প্রায় সকল অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এটা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল যে, শূকরের গোশত উত্তমরূপে পাকানো হলে ক্ষতিকর কৃমির ডিম্বাণু ধ্বংস হয়ে যায়। আমেরিকার এক গবেষণায় Trichura Tichurasis রোগে আক্রান্ত ২৪ জন লোকের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে তাদের মধ্যে ২২ জন শূকরের গোশত খুবই উত্তমরূপে পাক করেছেন। তাই একথা প্রমাণিত হয় যে, শূকরের গোশতের মধ্যে বিদ্যমান জীবাণু ও তাদের ডিম্বাণুগুলো খুব বেশি পরিমাণ উত্তাপেও মরে না।

শূকরের গোশতের চেয়ে এর চর্বির বেশি ক্ষতিকর এর গোশত খেলে পক্ষাঘাত ও হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগ হয় এবং অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আমেরিকার শতকরা ৫০ ভাগ লোক উচ্চ রক্তচাপের রোগী। শূকর এ দুনিয়ার সবচেয়ে নাপাক প্রকৃতির জানোয়ার। যা পায়খানা এবং ময়লা-আবর্জনার ওপর জীবন-যাপন করে। এবং একে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে অধিক নিকৃষ্ট জিনিসে জীবন রক্ষাকারী এবং ময়লা আবর্জনার ওপর লালিত-পালিত প্রাণী বানিয়েছেন। গ্রামে সাধারণভাবে ল্যাট্রিন নেই, যার কারণে লোকজন খোলা স্থানে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। এবং এ ধরনের ময়লা বেশির ভাগ শূকরেরা খতম করে। কেউ কেউ বলেন যে, উন্নত দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়া বা এ ধরনের দেশে শূকরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে জীবন-যাপন করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পরিষ্কার স্থানে বিদ্যমান নিজেদের পায়খানাই নয় বরং সমস্ত সঙ্গীদের বর্জ্য ভক্ষণ করে। দুনিয়াতে বিদ্যমান সকল প্রাণীর মধ্যে লজ্জাহীন এবং এটা একমাত্র প্রাণী যে অন্য সঙ্গীকে নিজ স্ত্রী শূকরী সঙ্গিনীর সঙ্গে জৈবিক চাহিদা পূরণের আহ্বান জানায়। আমেরিকার অধিকাংশ লোক এর গোশত ভক্ষণ করে এবং ড্যান্স পার্টির পরে নিজ স্ত্রীদের বদল করে এবং বলে তুমি আমার স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হও এবং আমি তোমার স্ত্রীর সাথে শয়ন করব। শূকরে গোশত ভক্ষণকারীদের মাঝে শূকরের স্বভাবের প্রতিফলন ঘটে।

প্রশ্ন : মুসলমানরা কেনো পশু হত্যা ও গোশত ভক্ষণ করে?

সবধর্মেই পশু হত্যা ও গোশত ভক্ষণ বৈধ

উত্তর : ভেজিটেরিয়ান অর্থাৎ নিরামিষ ভোজন সারা পৃথিবীতে এক প্রকার আন্দোলনের রূপলাভ করেছে। কিছু লোক একে প্রাণী অধিকারের সাথে গুলিয়ে ফেলে এবং বহু লোকজন খাদ্য হিসেবে গোশত এবং অন্য যাবতীয় অবৃক্ষীয় জিনিস ব্যবহার করাকে প্রাণী অধিকারের বিরোধী মনে করেন।

ইসলাম এসব প্রাণীর সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ প্রদান করেছে। এর সাথে ইসলামে একথাও আছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৃথিবীর বুকে 'সবজি এবং প্রাণী' মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে এ সীমা মানুষের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যে, সে কী পন্থায় ইনসাফের সাথে আল্লাহ তাআলার এসব নিয়ামত ও আমানত বিবেচনার সাথে ব্যবহার করবে। আসুন আমরা আরেকভাবে বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করি।

কোনো মুসলমান সবজি খেয়েও একজন উত্তম মুসলমান হতে পারেন। তার জন্য আবশ্যক নয় যে তাকে গোশত খেতে হবে। কুরআনে মুসলমানদের গোশত

খাবার অনুমতি আছে। আল-কুরআনের সূরা নাহাল-এর ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন –

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۔

অর্থ ঃ তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য এতে শীতবস্ত্রের উপকরণসহ আরো অনেক ধরনের উপকার রয়েছে। তাদের কিছু অংশকে তোমরা আহারও করে থাকো।

আরোও বলা হয়েছে ২৩ নং সূরা মুমিনুন এর ২১ নং আয়াতে। সেখানে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۔

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তার উদরস্ত বস্তু থেকে তোমাদের (দুধ) পান করাই। তোমাদের জন্যে তাতে আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে এবং তার গোশতও তোমরা খাও।

আমিষ জাতীয় খাবার যেমন ডিম, মাছ এবং গোশতের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন আছে। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন অর্থাৎ অতি প্রয়োজনীয় ৮ (আট) প্রকারের অ্যামাইনো এসিড আছে। যা আমাদের দেহ তৈরি করতে পারে না, তা এখান থেকে পেতে হয়। গোশতের মধ্যে ফাওলাদ, ভিটামিন বি-ওয়ান ও নিয়াসিনও আছে।

এছাড়াও যদি আপনি তৃণভোজী প্রাণী যেমন গাভী, ভেড়া, বকরী ইত্যাদির দাঁত দেখেন তাহলে আপনি ঘাবড়ে যাবেন। এ সকল প্রাণীর দাঁত চ্যাপ্টা যা সবজি জাতীয় খাবারের জন্য উপযোগী এবং আপনি যদি মাংসাশী প্রাণীদের দেখেন, যেমন চিতাবাঘ, সিংহ, কুকুর ইত্যাদি, এদের দাঁত সুচালো যা গোশত ভক্ষণের জন্য উপযোগী। যদি আপনি মানুষের দাঁত দেখেন তা ধারালো ও চ্যাপ্টা এ দু'রকমের হয়। এজন্য তাদের দাঁত গোশত ও সবজি উভয় ধরনের খাবার গ্রহণের মতো উপযোগী করে গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ এরা সব জিনিস খেতে পারবে। এখানে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে যদি নিরামিষ ভোজী বানাবেন তাহলে এ সুচালো দাঁতগুলো কেন দিলেন? একথা নিশ্চিত যে, তিনি জানতেন মানুষের জন্য দুই ধরনের খাবারের প্রয়োজন রয়েছে। তৃণভোজী প্রাণীদের হজম প্রক্রিয়া শুধু পাতাযুক্ত খাবার হজম করে থাকে এবং মাংসাশী প্রাণীর হজম প্রক্রিয়া গোশত হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া সবজি এবং

গোশত এ উভয় প্রকার খাদ্য হজম করতে সক্ষম। যদি আল্লাহ চাইতেন আমরা শুধু নিরামিষ ভোজী হবো, তাহলে কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উভয় প্রকারের হজম প্রক্রিয়া দিলেন? অনেক হিন্দু আছেন যারা সব সময় নিরামিষ খেয়ে থাকেন। তাদের ধারণা হলো, আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন গোশত ইত্যাদি ভক্ষণ তাদের ধর্ম বিরোধী হবে। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে তাদের ধর্মের অনুসারীদের গোশত খাওয়ার অনুমতি প্রদান করে। এগুলোর মধ্যে লেখা আছে, হিন্দু মুনি ঋষিরা গোশত ভক্ষণ করতেন। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মনুস্মৃতির ৫ম অধ্যায়ের ২৩তম লাইনে বলা হয়েছে–

কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন মাংসাশী প্রাণীর গোশতও খায়, তাহলে এতে ক্ষতির কিছু নেই। কেননা ঈশ্বর কিছু জিনিস খাওয়ার জন্য তৈরি করেছেন, আর কিছুকে তৈরী করেছেন ঐ জিনিসটির খাদ্য হিসেবে।

এভাবে মনুস্মৃতির ৫ম অধ্যায় এর ৩৯ ও ৪০ লাইনে এটাও লেখা রয়েছে–ঈশ্বর বলি দেয়ার জানোয়ারগুলোকে স্বয়ং বলির জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বলির জন্য তাদের হত্যা করা, হত্যা করা (ধ্বংস করা) নয়।

মহাভারত অনুশাসন প্রভা অধ্যায় নং ৮৮-তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও পিতিম-এর মধ্যে কথোপকথনে উল্লেখ আছে যে, শরধার নিয়মে পেতরীকে উপঢৌকন হিসেবে কোনো খোরাক দেয়া উচিত, যাতে এর কারণে নারদের শান্তি মিলে। যুধিষ্ঠির বলেন, হে মহাশক্তি! আমি আমার বাপ-দাদাদের জন্য কী জিনিস দিতে পারি যা কখনো শেষ না হয়, যা সবসময় থাকে, অমর হয়ে যায়। ভীষণ উত্তর দিল, হে যুধিষ্ঠির শোন! তা কোন জিনিস যেগুলো শরধা জান্তার নিকট এ ধরনের নিয়মের জন্য উপযোগী। হে মহারাজ! তার মধ্যে বীজ, চাল, যব, মাশকলাই, পানি এবং এ জাতীয় ফল হলো এমন বস্তু। মাছ দিলে তাদের আত্মা দু'মাস পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে, ভেড়ার গোশতে তিন মাস, খরগোশের গোশতে চার মাস, বকরীর গোশতে পাঁচ মাস, শূকরের গোশতে ছয় মাস, পাখির গোশতে সাত মাস, ডোরাকাটা হরিণের গোশতে আট মাস, কৃষ্ণসার হরিণের গোশতে নয় মাস, গাভীর গোশতে দশ মাস, মহিষের গোশতে এগারো মাস, নীল গাইয়ের গোশতে এক বছর, তাদের আত্মা শান্তিতে থাকে। ঘি মেশানো পেঁয়াজও সে গ্রহণ করে। ধর্মীয় নাম বড় মহিশ অর্থাৎ নীল গাইয়ের গোশতে বারো মাস পর্যন্ত। গণ্ডারের গোশত যা চন্দ্র মাসের হিসেবে পরোক্ষ বর্ষার ওপর দেয়া হয় তা কখনো শেষ হবে না। বুটি, [illegible] ফুল, পেঁচা এবং লাল ছাগলের গোশতও দেয়া যাবে, তবে তাও কখনো শেষ হবে না। এজন্য এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, যদি আপনি আপনার পূর্ব পুরুষদের আত্মার শান্তি করতে চান তাহলে এ সুযোগে লাল ছাগলের গোশত পেশ করুন।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে গোশত খেতে নিষেধ করা হয়নি। অনেক হিন্দু অপর ধর্মের প্রভাব থেকে শুধু সবজি ও ডাল ইত্যাদি খাওয়া গ্রহণ করেছেন, এগুলোর মধ্যে প্রথমেই হলো জৈন মত। কিছু কিছু ধর্ম সবজি এবং ডালকে সঠিক খাবার হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কারণ এসব ধর্ম প্রাণী হত্যার বিরোধী যদি কেউ প্রাণী হত্যা ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে, তাহলে আমিই হব প্রথম সেই ব্যক্তি। কিন্তু এটা সম্ভব নয়।

অতীত লোকজনের ধারণা এই ছিল যে, গাছের প্রাণ নেই। কিন্তু আজ এটা এক গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনীন মত, গাছেরও প্রাণ আছে। আজ এ ধরনের লোকদের কথাও হালকা হয়ে গেছে যারা সবজি ভক্ষণ করে এবং জীব হত্যা করে না। কারণ বৃক্ষ ও সবজি কাটাও জীব হত্যা করা। একটি যুক্তি দেখানো হয় গাছের অনুভূতি নেই। এজন্য গাছ ও সবজি কাটা প্রাণী হত্যার চেয়ে লঘু অপরাধ। কিন্তু আজ বিজ্ঞান আমাদের বলছে বৃক্ষও কষ্ট অনুভব করে। তবে হ্যাঁ তাদের চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ মানুষ শুনতে পায় না। মানুষের কান এদের আওয়াজ শুনতে পায় না। কারণ মানুষের কানের শ্রুতিশক্তি ২০ ডেসিবেল থেকে ২০ হাজার ডেসিবেল পর্যন্ত। বৃক্ষের ডেসিবেল এর বাইরে। যদি ডেসিবেল কোন আওয়াজ এর চেয়ে কম বেশি হয়, তাহলে মানুষের কান তা শুনতে সক্ষম নয়। কুকুর ৪০ হাজার ডেসিবেল পর্যন্ত আওয়াজ শুনতে পায়। যে শব্দের ডেসিবেল ৩০ হাজারের ওপরে এবং ৪০ হাজারের কম তা শুধু কুকুরই শুনতে পায়। মানুষ শুনতে পায় না। কুকুর নিজের মালিকের বাঁশির আওয়াজ শোনে এবং তার নিকট চলে আসে। একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী গবেষণার পর এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দ্বারা বৃক্ষের চিৎকারও এভাবে রূপান্তর করা সম্ভব যা মানুষের শ্রবণযোগ্য। এটা দ্বারা তৎক্ষণাৎ বার্তা পৌঁছে যায় যে, কখন বৃক্ষ পানির জন্য চিৎকার করছে। আধুনিক গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃক্ষ খুশি ও কষ্ট অনুভব করে এবং চলতেও পারে।

একজন বিজ্ঞ নিরামিষভোজীর সাথে আমার বিতর্ক হলো, তিনি বললেন, আমি জানি বৃক্ষের জীবন আছে এবং কষ্টও অনুভব করে, কিন্তু বৃক্ষ প্রাণীর চেয়ে দুটি অনুভূতি কম রাখে, এজন্য বৃক্ষ হত্যা প্রাণী হত্যার চেয়ে লঘুতর অপরাধ। কিন্তু সাধারণ সমাজকে জিজ্ঞেস করি, ধরুন! আপনার একজন ভাই যে জন্ম থেকে বোবা ও বধির এবং অন্য লোকের চেয়ে তার দুটি অনুভূতি কম এবং সে বড় হলে কেউ তাকে হত্যা করল। আপনি কি বিচারককে বলবেন যে, হত্যাকারীকে শাস্তি কম দিন কারণ সে দু'অনুভূতি কমসম্পন্নকে হত্যা করেছে? না, বরং আপনি বিচারককে বলবেন, একে অধিক শাস্তি দিন কারণ আমার ভাই ছিল নির্দোষ। আল-কুরআনের

সূরা বাকারার ১৬৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .

অর্থ ঃ তোমরা খাও জমিনের বুকে যা হালাল ও পবিত্র, তা থেকে।

যদি দুনিয়ার সকল লোক নিরামিষভোজী হতো, তাহলে দুনিয়ায় প্রাণীর সংখ্যা সীমাহীনভাবে বেড়ে যেতো। কারণ এদের জন্ম ও বৃদ্ধি হয় খুব দ্রুত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিজ্ঞতার সাথে নিজ সৃষ্টির মধ্যে এক বিশেষ ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে প্রাণী ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করেছেন, এটা ভেবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি নিরামিষভোজীকেও মন্দ মনে করি না। পক্ষান্তরে যিনি আমিষ ভক্ষণ করতে প্রাণী হত্যা করেন তাকেও নির্দয় বলা যাবে না।

প্রশ্ন : মুসলমানগণ প্রাণীদের নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করে কেনো?

মুসলিম যবেহ্ পদ্ধতি কোমল ও বৈজ্ঞানিক

উত্তর : যবেহ্ করার পদ্ধতি অর্থাৎ যেভাবে মুসলমানগণ প্রাণীদের জবাই করে অধিকাংশ অমুসলমানের নিকট তা সমালোচনার বিষয়। যদি কিছু বিষয়ে জানা যায় তাহলে অনুধাবন করা যাবে যে, জবাই করার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে দয়াশীল ও বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েও উত্তম। ইসলামি পদ্ধতিতে প্রাণীদের হত্যা করার সময় কিছু শর্তাবলির দিকে খেয়াল রাখতে হয়– প্রাণীদের তীক্ষ্ণ ধারালো চাকু অথবা ছুরি দিয়ে জবাই করতে হবে যাতে প্রাণীর কষ্ট সবচেয়ে কম হয়। 'যবেহ্' শব্দটি আরবি। শব্দটির অর্থ হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা। প্রাণীদের জবাই করার সময় এদের গলা, শ্বাসনালী এবং ঘাড়ের রক্তনালী কেটে এদের হত্যা করতে হবে। প্রাণীদের মাথা পৃথক করার পূর্বে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সকল রক্ত বের করা উচিত। রক্ত বের করার কারণ এই যে, রক্তের মধ্যে খুব সহজেই জীবাণু প্রবিষ্ট হয়। আর একবারেই মস্তক না কাটা উচিত, কেননা এরূপ করলে হার্টের দিকে প্রবাহিত ধমনীগুলো কেটে হার্টের ধমনী বাধাগ্রস্ত হয় এবং রক্তনালীর মধ্যে জমে যায়।

রক্ত হলো বহু প্রকারের জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিন স্থানান্তরের মাধ্যম। সব রক্তের মধ্যে সকল প্রকারের জীবাণু বিদ্যমান থাকে বলে পুরোপুরিভাবে রক্ত প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ করলে জবাই করা গোশত বেশি সময় পর্যন্ত তাজা থাকে, কারণ প্রাণীর রক্ত শরীর থেকে বের হয়ে যায় এবং তীক্ষ্ণতার সাথে কাটার কারণে নার্ভ-এর নিকট রক্ত প্রবাহিত হয় যা ব্যথার অনুভূতি বিলোপ করে এবং প্রাণী ব্যথা অনুভব করে না। যবেহ্ করার জন্য প্রাণী যে

তড়পাতে থাকে এবং পা ছুটোছুটি করে তা ব্যথার জন্য নয় বরং রক্ত [illegible] কারণে। এ ছোটাছুটিতে রক্ত শরীর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারেও সুবিধা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : মানুষ যা ভক্ষণ করে তা তার ওপর প্রভাব ফেলে। ইসলাম নিজ অনুসারীদের কেনো আমিষজাতীয় খাদ্য যেমন:- গোশত, মাছ ইত্যাদি খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে? প্রাণীর গোশত মানুষকে কি রূঢ় ও অত্যাচারী বানায় না?

পুষ্টির জন্য আমিষ খাদ্য প্রয়োজন

উত্তর : আমি একথার সাথে একমত যে, মানুষ যা ভক্ষণ করে সেটার প্রভাব তার নিজের ওপর পড়ে। এজন্য ইসলাম হিংস্র এবং ফেড়ে ছিলে ফেলায় অভ্যস্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছে এবং তাদের খাওয়া হারাম করে দিয়েছে। যেমন– বাঘ, চিতা ইত্যাদি যা হিংস্র এবং রক্তখেকো প্রাণী। এদের গোশত খেলে মানুষ রূঢ় ও অত্যাচারী হয়। এজন্য ইসলাম শুধু পাখি অথবা তৃণভোজী প্রাণীর গোশত খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। মুসলমানগণ সহজে জীবনধারণকারী নিরীহ প্রাণীদের গোশত খায়। কেননা সে নিরাপত্তা, একতা ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। নবী করীম (স) সে সকল জিনিস খেতে নিষেধ করেছেন যা উৎকৃষ্ট নয়। কুরআনের সূরা আরাফ-এর ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

অর্থ ঃ নবী তাদের ভালো কাজের আদেশ দেন মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, যিনি তাদের জন্য যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে হারাম ঘোষণা করেন।

এবং সূরা হাশর-এর ৭নং আয়াতেও আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন –

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ . وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا .

অর্থ ঃ রাসূল (স) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

একজন মুসলমানের জন্য রাসূল করিম (স) এর নির্দেশই যথেষ্ট; আল্লাহ্ চান যে, মানুষ সেই পশুর গোশত খাবে যা তার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো খাবে না যেগুলোর অনুমতি প্রদান করা হয়নি।

সহীহ মুসলিমের হাদীস নং ১৯৩৪, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যাতে যবেহ করার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইবনে মাজার হাদীস নং ৩২৩২, ৩২৩৩, এবং ৩২৩৪ ইত্যাদিতে দু'ধরনের প্রাণী হারাম করার কথা বলা হয়েছে।

- নখধারী। অর্থাৎ ঐ বুনোপ্রাণী যাদের দাঁত সুচালো এবং তা মাংসাশী এবং বিড়াল প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন : বাঘ, সিংহ, চিতা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পুঁজি করে খাওয়া প্রাণী যেমন ঃ ইঁদুর ইত্যাদি। বিষাক্তপ্রাণী যেমন : সাপ ইত্যাদি।
- থাবা দ্বারা শিকার ধরে এমন পাখি, যেমন : চিল, শকুন, কাক ইত্যাদি।

তাছাড়া এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যে আমিষ ভোজন অর্থাৎ গোশত খেলে মানুষ রূঢ় হয়ে যায় বা এ ধরনের স্বভাব গঠিত হয়।

প্রশ্ন : মুসলমানগণ এক কুরআনের অনুসরন করে। এরপরও তাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে এতো পার্থক্য কেনো? ইসলামে এতো ফিরকা বা দল কেনো?

সঠিক অনুসরণের অভাবে মতপার্থক্য

উত্তর : ইসলামে এ ধরনের সুযোগ না থাকলেও আজ মুসলমানগণ বিভক্ত হয়ে গেছে। ইসলাম নিজ অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। আল-কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে রয়েছে–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

অর্থ ঃ তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

এখানে আল্লাহর কোন রজ্জুর/ রশির উল্লেখ হয়েছে? উত্তরে বলা যায়- এটা আল্লাহর রশি, যা সকল মুসলমান মজবুতভাবে ধারণ করবে। এ আয়াতে দুটি নির্দেশ আছে–

১. সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর এবং
২. পৃথক হয়ো না, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আল-কুরআনে এটাও বর্ণিত আছে সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।

এ কারণে সকল মুসলমানের কুরআন ও হাদীসের ওপর আমল করা আ

নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না। আল-কুরআনে সূরা আনআম, আয়াত নং ১৫৯ - এ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

অর্থ ঃ যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো করে নিজেরাই নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ তাআলার হাতে। তখন তিনি তাদের জানিয়ে দিবেন তাদের কৃতকর্ম যা তারা করে।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদের মুসলমানদের থেকে পৃথক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা দ্বীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে। যখন মুসলমানদেব জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কোন মুসলমান? তখন সাধারণত উত্তর আসে আমরা সুন্নী, আমরা শিয়া। এভাবে কিছু লোক নিজেদের 'হানাফী', 'মালেকী', 'শাফেয়ী' অথবা 'হাম্বলী' বলে। কেউ কেউ বলে আমরা 'দেওবন্দী' অথবা 'বেরলভী'। এ লোকদের নিকট একথা জিজ্ঞেস করা উচিত যে, আমাদের নবী করীম (স) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? তিনি কি হাম্বলী, শাফেয়ী, মালেকী না হানাফী ছিলেন? মোটেই না, আল্লাহর সকল নবী যেমন মুসলমান ছিলেন মুহাম্মদ (স)ও তাই ছিলেন। কুরআন বর্ণনা করে হযরত ঈসা (আ) মুসলমান ছিলেন এবং নিজ অনুসারীদের সেরূপ নির্দেশ প্রদান করেছেন। সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে রয়েছে ঃ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ-কে আছো আল্লাহর পথে, আমার সাহায্যকারী? উত্তরে তার অনুসারী সঙ্গীগণ বলেছেন–

نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন আমরা সবাই মুসলমান।

এ শব্দগুচ্ছ প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর অনুসারীগণ মুসলমান ছিলেন। এরূপভাবে সূরা আলে ইমরানের ৬৭ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ ঃ (সঠিক ঘটনা হলো এই যে,) ইবরাহীম না ছিলেন ইহুদি, না ছিলেন খ্রিস্টান, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি মুশরিকদের দলভুক্তও ছিলেন না।

ইসলামের অনুসারীদের এ কথায় সম্মতি আছে যে, তারা নিজেদের মুসলমান পরিচয় দেয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান মনে করে এবং তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি ' কোন, কে?' তাহলে উত্তর দেয়া উচিত 'আমি মুসলমান।' এ ভাবে নিজেদের 'হানাফী', 'শাফেয়ী' এরূপ বলা উচিত নয়।

কুরআনের সূরা হা-মীম আস-সিজদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থ ঃ তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ আমল করে এবং বলে যে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে আপনার অনুধাবন করা উচিত যে আল্লাহ এ আয়াতে একথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন– আমি মুসলমান। রাসূল করিম (স) ৭ হিজরিতে অমুসলিম শাসকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য চিঠি লিখিয়েছিলেন। যার মধ্যে, রোম, সিরিয়া, হাবসী, খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সূরা আলে ইমরানের শব্দাবলি লিখিয়েছিলেন– وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ ঃ তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা মুসলমান।

আমি মুসলিম উম্মাহকে সম্মান জানাই, যাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম মালেক (র) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম আছেন। এঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের গবেষণা ও শ্রমের প্রতিদান তাঁদের দিন। যদি কোনো ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র) অথবা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বিশ্বাস অথবা দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের গবেষণার সাথে একমত হন, তবে তার ওপর কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে আপনি কে? উত্তরে বলা উচিত– আমি 'মুসলমান'। কিছু লোক আবু দাউদ শরীফের হাদীস নং ৪৫৭৯ এর বর্ণনা দেন যা হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত–

'নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ৭৩ কাতারে বিভক্ত হবে, ৭২ দল দোযখে যাবে এবং এক দল জান্নাতে যাবে, যেটা হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।'

হাদিসটিকে অনেকে অপব্যাখ্যা করেন যে নবী করীম (স) ৭৩ দল হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি তো একথা বলছেন না যে মুসলমান বিভক্ত হবার চেষ্টা করছে। কুরআন দলে দলে বিভক্ত হওয়ার পথকে রুদ্ধ করতে চায়। যে লোক কুরআন ও হাদীসের ওপর আমল করে সে দল তৈরি করে না এবং লোকদের বিভক্ত করে না, সে সোজা রাস্তায় থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিরমিযীর ২৬৪১নং হাদীসে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন–

"আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, এ সকল দল জাহান্নামে যাবে এক দল ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা কোন দল? তিনি বললেন: ঐ দল, যে আমার ও আমার সাহাবীদের পথের ওপর চলবে।"

কুরআনের বহু আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। একজন মুসলমানের উচিত কুরআন এবং সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা। তার কোনো আলেম বা ইমামের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত একমত হওয়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুসারে হবে। যদি তার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধান ও নবী করীম (স) বিধান ও নবী করীম (স) এর সুন্নাতের বিপরীত হয়, তবে তার কোনো গুরুত্ব নেই। যদি সকল মুসলমান কুরআন বুঝে অধ্যয়ন করে এবং সহীহ হাদীসের ওপর আমল করে, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মতানৈক্যের অবসান ঘটবে এবং মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ উম্মত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : যদি ইসলাম একটি সুন্দর ধর্মই হয়ে থাকে, তাহলে অগণিত মুসলমান বেঈমান কেনো? তারা ধোঁকা দেয়, ঘুষ খায় এবং নিষিদ্ধ কাজের সাথে কেনো জড়িত?

ব্যক্তির ত্রুটির জন্য আদর্শ দায়ী নয়

উত্তর : কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ইসলাম একটি অনুপম জীবনব্যবস্থা। কিন্তু মিডিয়া পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে। আর পশ্চিমারা সবসময় ইসলামকে ভয় পায় তাই এই মিডিয়া সবসময় ইসলামের বিপরীত সংবাদ এবং তথ্য প্রচার করেন এরা ইসলামের ব্যাপারে ভুল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং ভুল উৎস থেকে সংবাদ দেয়। মূল ঘটনাকে রাঙিয়ে প্রচার করে। কোথাও বোমা ফাটলে বিনা প্রমাণে মুসলমানদের ওপর অভিযোগ চাপিয়ে দেয়া হয়। খবরে এ ধরনের অভিযোগ ব্যাপক কভারেজ পায়। আবার যখন বিশ্লেষণের পর অমুসলিমদের কারসাজি প্রমাণিত হয়, তখন সংবাদ দায়সারা গোছের কভারেজে প্রকাশিত হয়। যদি ৫০ বছরের কোনো মুসলমান ১৫ বছরের কোনো বালিকাকে বিয়ে করে, তবে পশ্চিমা সংবাদপত্র এ খবরকে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে প্রচার করে, কিন্তু যদি কোনো ৫০ বছরের অমুসলিম ৬ বছরের কোনো বাচ্চাকে ধর্ষণ করে। তাহলে এ খবর মামুলি সংবাদের সাথে সাধারণ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।

আমেরিকায় প্রতিদিন ২ হাজার ৭ শত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে কিন্তু এ খবরগুলো প্রচার করা হয় না। কারণ এ ঘটনা আমেরিকানদের জন্য তুচ্ছ ব্যাপার, তা জীবনের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে।

আমি এটা জানিয়ে দিতে চাই, এমন মুসলমান অবশ্যই আছে, যে দ্বীনদার নয়, ধোঁকা দেয়া এবং অনেক ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত আছে। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া এমনভাবে প্রচার করে যেন এরূপ অপকর্ম শুধু মুসলমানরাই করে। অথচ বাস্তবতা হলো এমন লোক দুনিয়ার সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যেই পাওয়া যায়। আমার জানা আছে যে, অনেক মুসলমান অমুসলিমদের সাথে মিলে মদ্যপান করে। মুসলিম সমাজেও এরূপ লোক আছে, তবে অবশ্যই সার্বিক বিচারে মুসলিম সমাজ উন্নত সমাজ। ইসলামি সমাজই হলো সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য, যেখানে মদপানের বিরোধিতা করে এবং ভিন্ন কথায় সাধারণভাবে মুসলমান মদপান করে না।

সার্বিক বিচারে এটা ঐ সমাজ যা সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কল্যাণ করে এবং যার পর্যাপ্ত লজ্জা, চিন্তা-ভাবনা, চরিত্র গঠন ও মানবতার সম্পর্ক আছে। দুনিয়ার কোনো সমাজ এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না। বসনিয়া, ইরাক এবং আফগানিস্তানের মুসলমান বন্দিদের সাথে খ্রিস্টানদের অত্যাচারী আচরণ এবং বৃটেনের মহিলা সাংবাদিকদের সাথে তালেবানদের আচরণ এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

যদি আপনি জানতে চান মার্সিডিজ-এর নতুন মডেলের গাড়ি কেমন এবং যে লোক ড্রাইভিং সম্পর্কে জানে না, তিনি যদি স্টিয়ারিং-এ বসেন এবং গাড়ি নষ্ট করেন তাহলে এ দোষ কাকে দিবেন? গাড়ি নাকি ড্রাইভারকে? নিশ্চিতভাবে আপনি ড্রাইভারকে দোষ দেবেন। গাড়ি কীরূপ এটা জানার জন্য ড্রাইভার নয় বরং গাড়ির বৈশিষ্ট্য এবং তার বিভিন্ন পার্টসের যাচাই প্রয়োজন। এটা কী গতিতে চলে? কোন

প্রকারের ইঞ্জিন ব্যবহার করে? এটা কী পরিমাণ নিরাপদ ইত্যাদি। য
মানা হয় যে, মুসলমানগণ সঠিক পথে নেই, তারপরও আমি ইসলামের অনুসারীদের পরীক্ষা করতে বলব না। যদি আপনি জানতে চান যে ইসলাম কতটা ভালো ধর্ম তাহলে এর মূল জিনিসগুলো পরীক্ষা করা উচিত। অর্থাৎ কুরআন এবং সহীহ হাদীস। যদি আপনি আমলের দিক দিয়ে এটা দেখতে চান যে, গাড়িটি কেমন তাহলে স্টিয়ারিং-এ এমন কাউকে বসান যিনি দক্ষ ড্রাইভার। অনুরূপভাবে যদি এটা জানতে চান ইসলাম কেমন জীবনব্যবস্থা, তাহলে এর উত্তম পদ্ধতি হলো আল্লাহর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সামনে রাখুন। মুসলিম ছাড়াও অনেক উদারপন্থী অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বোত্তম মানব ছিলেন।

মাইকেল এইচ. হার্ট 'দি হানড্রেড' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটিতে মুহাম্মদ (স)-এর নাম সর্বপ্রথম রয়েছে। বইটিতে অনেক অমুসলিম ব্যক্তিত্ব আছে, যাদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স) অনেক বেশি প্রশংসা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : অমুসলিমদের মক্কা ও মদিনায় প্রবেশাধিকার নেই কেনো?

সংরক্ষিত এলাকা সবদেশেই আছে

উত্তর : এ কথা সত্য যে, আইন অনুযায়ী অমুসলিমদের মক্কা-মদিনায় প্রবেশাধিকার নেই। এর অনেক কারণ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমি ভারতের একজন নাগরিক। তা সত্ত্বে ভারতের বহু স্থানে যাওয়ার অনুমতি নেই। যেমন : ক্যান্টনমেন্ট। প্রত্যেক রাষ্ট্রে এমন কিছু এলাকা থাকে যেখানে কোনো সাধারণ নাগরিকের প্রবেশাধিকার থাকে না। যে ব্যক্তি সেনা বাহিনীতে কর্মরত থাকে অথবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত থাকে কেবল তাদের জন্য অনুমতি থাকে। এরূপভাবে ইসলাম সকল মানুষকে নিয়ে এক বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলামের ক্যান্টনমেন্ট বা নিষিদ্ধ এলাকা হলো মাত্র দুটো। ১. মক্কা শরীফ এবং ২. মদিনা শরীফ। এখানে কেবল ঐ লোক প্রবেশ করতে পারবেন যিনি ইসলাম কবুল করেছে বা ইসলামের রক্ষক। একজন অমুসলিম বা সাধারণ লোকের জন্য ঐ এলাকায় প্রবেশ করা অযৌক্তিক এবং তার ছাউনীতে প্রবেশ করা আনুগত্য বিরোধী। একইভাবে অমুসলিমদের এ অভিযোগ তোলা সম্পূর্ণ ভুল যে কেনো তাদের মক্কা মদিনায় প্রবেশে বাধা প্রদান করা হচ্ছে?

যখন কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় কোনো দেশে যেতে চায় তখন তাকে সর্বপ্রথম ঐ দেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হয়। যাকে ঐ দেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র (ভিসা) বলা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব বিধান, শর্তাবলি ও ভিসা চালু করার সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি রয়েছে, যে তা পূর্ণ করতে পারবে না সে অনুমতি পাবে না। ভিসার ব্যাপারে আমেরিকার বিধান হলো সবচেয়ে কঠোর; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের লোকদের জন্য। তাদের ভিসার জন্য অনেক শর্ত পূরণ করতে হয়।

আমি সিঙ্গাপুর যাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিই, তখন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মে নিয়ম ছিল যে, সেখানে নেশাদ্রব্য নিয়ে প্রবেশকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এরূপ প্রত্যেক দেশ কিছু নিয়ম করে থাকে। আমি এটা বলব না যে মৃত্যুদণ্ড পশুত্ব। যদি আমি এ সকল শর্ত মেনে নিই এবং এদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তাহলে ওখানে যাবার অনুমতি প্রদান করা হবে।

কোনো ব্যক্তি মক্কা-মদিনায় প্রবেশের মৌলিক শর্ত বা ভিসা হলো সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিবে যে,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

যার অর্থ হলো, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। তাহলে তিনি বিনা বাধায় এ স্থানে প্রবেশ করতে পারবেন।

প্রশ্ন : অমুসলিমদের কাফির বলা কি গালি নয়?

প্রকৃতি ও পরিচয় বলা গালি নয়

উত্তর : কাফির তাকে বলে, যে অস্বীকার করে বা ইসলামকে মিথ্যা মনে করে। এ শব্দ এসেছে, كفر থেকে, যার অর্থ মিথ্যারোপ করা বা গোপন করা, ঢেকে দেয়া। ইসলামে 'কাফির' তাকে বলা হয়, যে ইসলামের শিক্ষা এবং তার সত্যতা গোপন করে অথবা তাকে মিথ্যা মনে করে এবং যে ব্যক্তি ইসলামকে অস্বীকার করে তাকে বলা হয় অমুসলিম।

যদি কোনো অমুসলিম, নিজেকে অমুসলিম অথবা কাফির বলাকে গালি মনে করে, তাহলে এটা তার ভুল। তিনি না বুঝেই এমনটা মনে করতে পারেন। তাই তার উচিত ইসলাম এবং এর পরিভাষাগুলো বুঝে নেয়া; যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত একে গালি মনে না করা। 'কাফির' কোনো গালি নয়। বরং

মুসলমান এবং অন্য ধর্মের পরিভাষাগত পার্থক্য। এ ধারণার কথার মধ্যে [illegible] বা কোনো নিচুতার বিষয় নেই। একে গালি মনে করা কম জ্ঞান ও কম প্রজ্ঞারও পরিচায়ক।

প্রশ্ন : একথা কি সত্য নয় যে হযরত উসমান (রা) কুরআনের অনেক কপি, যা ঐ সময় পর্যন্ত ছিল, জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। তাহলে বর্তমান কুরআনকে আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী বলা যাবে কি?

কুরআনের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে

উত্তর : এটা আল-কুরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণামাত্র। কারণ ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) সেসব কপি জ্বালিয়ে দেন যেগুলোর মধ্যে কোনো মিল ছিল না। তিনি মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ঐ কুরআন সংরক্ষণ করেন যা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়; যা রাসূল (স) লিখিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং যার গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের কপি সম্পর্কে উত্থাপিত ভুল ধারণার জবাব দিচ্ছি।

বস্তুত রাসূল করীম (স) -এর ওপর ওহী নাযিল হলে আল্লাহ তাকে তা মুখস্থ করিয়ে দিতেন। পরে তিনি সাহাবীদের শোনাতেন এবং তিনি তা মুখস্থের নির্দেশ দিতেন। তিনি ওহী লেখকদের এ আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করারও নির্দেশ দিতেন। এবং নিজে শুনে সেগুলো যাচাই করতেন।

নবীজী (স) নিরক্ষর ছিলেন। লেখা-পড়া জানতেন না। এজন্য প্রতিবার ওহী নাযিলের পর সাহাবীদের উপস্থিতিতে তা পড়তেন যাতে তারা তা লিখে নিতে পারেন। আবার নবী করীম (স) তা নিজ থেকে শুনতেন এবং এর মধ্যে কোনো ভুল হলে তা চিহ্নিত করে ঠিক করাতেন। আর দুই বার তা শুনতেন ও নিশ্চিত করতেন। এভাবে সমগ্র কুরআনের লেখনি নবী করীম (স)-এর নিজের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ণ কুরআন সাড়ে বাইশ বছরব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণের সময়কাল-এর বিন্যাস অনুযায়ী করাননি। আয়াত এবং সূরার ওহীর বিন্যাসের ক্রমানুসারে তা করতেন এবং এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে তা বলে দিতেন। নাযিলকৃত আয়াত সাহাবাদের সামনে পড়ার সময় হযরত মুহাম্মদ (স) -এর আয়াত কোন সূরায় কোন আয়াতের পরে হবে তাও বলে দিতেন। প্রতি রমযানে হযরত মুহাম্মদ (স) কুরআনের

অবতীর্ণ অংশের আয়াতের বিন্যাস পর্যালোচনা করতেন এবং হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁকে নিশ্চিত করতেন। হযরত মুহাম্মদ (স) -এর ইনতিকালের পূর্বের রমযানে কুরআনের প্রত্যয়ন দুবার হয়েছে। তাই একথা পুরোপুরি পরিষ্কার যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআনের সংকলন, প্রত্যয়ন, লেখনি ও সাহাবা কিরামদের মুখস্থ করানো হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনকালে পূর্ণ কুরআন আয়াতের সঠিক বিন্যাস এবং ক্রমানুসারেই মজুদ ছিল। আর এর আয়াতগুলো পৃথক পৃথক চামড়ার টুকরা, হালকা পাথর, গাছের পাতা, খেজুরের ডাল এবং উটের হাড় ইত্যাদির ওপর লেখা হয়েছিল। তাঁর ওফাতের পর ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে বিভিন্ন জিনিসের ওপর লিখিত কুরআনের অংশগুলো একস্থানে লিপিবদ্ধ করে পাতার আকার দেয়া হয়। এ পাতাগুলোকে মোটা সুতা দ্বারা বাঁধা হয়েছিল যাতে এর কোনো অংশ নষ্ট না হয়। আবূ বকর (রা)-এর জীবদ্দশায় এ কপি তাঁর নিকট ছিল এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে তাঁর নিকট ছিল। এরপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁর প্রচার হয়নি।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে পবিত্র কুরআনের কিছু শব্দ লেখা ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এ মতানৈক্যে অর্থের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি না করলেও নও মুসলিম অনারবদের নিকট এরও অনেক গুরুত্ব ছিল। কিছু লোক নিজেদের পাঠকে সঠিক এবং অন্যদের পাঠকে ভুল বলতেন। এজন্য হযরত উসমান (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে কুরআনের মূল কপি চেয়ে নেন; যে কপিটির মৌলিকত্ব নিশ্চিত করেছিলেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (স)। হযরত উসমান (রা) হযরত মুহাম্মদ (স) -এর নির্দেশে কাজ করেছিলেন। কুরআনের চার লেখক সাহাবী যাদের প্রধান ছিলেন হযরত যায়িদ বিন সাবিত, তাঁদের দায়িত্ব দিয়ে আল-কুরআনের প্রতিলিপি লেখার নির্দেশ দেন। এ কপিগুলোকে মুসলমানদের বড় বড় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিছু লোকের নিকট আল-কুরআনের খণ্ডিত অংশ নানা আকৃতিতে মজুদ ছিল। সম্ভবত এতে কিছু (আঞ্চলিক হরফে বা উচ্চারণে) অশুদ্ধ কিংবা অসম্পূর্ণ ছিল। এজন্য হযরত উসমান (রা) এ সকল লোকদের নিকট মূলকপির অনুরূপ নয় এমন কপিগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। যাতে কুরআনের বিশুদ্ধ কপি

মৌলিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সত্যায়িত মূল কুরআনের অনুলিপি আজো পৃথিবীতে সংরক্ষিত আছে। যার মধ্যে এক কপি উজবেকিস্তান-এর তাসখন্দ শহরের যাদুঘরে এবং দ্বিতীয় কপি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের তোপকাপি যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

কুরআনের মূলকপিগুলোতে এবং হরকতের ইরাব হিসেবে ব্যবহৃত তিনটি চিহ্ন যাকে আরবিতে 'ফাতহা', 'দম্মা', 'কাসরা' (উর্দুতে ' যের', 'যবর', ' পেশ') বলা হয়; এছাড়াও রয়েছে 'তাশদীদ', 'মদ', এবং 'জযম' ইত্যাদি। আরবী ভাষীদের জন্য সঠিক উচ্চারণে পড়ার জন্য এ চিহ্ন অপরিহার্য ছিল না। কেননা আরবি ছিল তাদের মাতৃভাষা। অনারবদের জন্য এ ইরাব (اِعْرَابْ) ব্যতীত কুরআনের সঠিক উচ্চারণ সহজ ছিল না। এ জন্য এ সকল চিহ্ন বনু উমাইয়ার পঞ্চম খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে (৬৬ থেকে ৮৬ হিজরি ৬৮৫ থেকে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আগ্রহে আল-কুরআনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

কতিপয় ব্যক্তি একথাও বলে যে, কুরআন শরীফের বর্তমান রূপ যার মধ্যে ইরাব ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে তা হযরত মুহাম্মদ (স) এর সময়কার মূল কুরআন নয়। কিন্তু তারা এ সাধারণ কথাটি বুঝতে সক্ষম হননি যে, কুরআনের শাব্দিক অর্থ বার বার পড়া, অর্থাৎ তিলাওয়াত করার জিনিস। এজন্য লেখার নিয়ম কিছুটা ভিন্ন অর্থাৎ এর মধ্যে হরকত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, পবিত্র কুরআনে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত যদি আরবি ভাষায় এবং তার উচ্চারণ ওটাই থাকে যা শুরুতে ছিল তাহলে অবশ্যই বলব যে, এটার অর্থ তা-ই আছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর-এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থ ঃ আমিই উপদেশ (সম্বলিত কুরআন) নাযিল করেছি, আমিই এর সংরক্ষণকারী।

তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আর আল্লাহ নিজেই এর সংরক্ষণকারী।

প্রশ্ন : কুরআনে আল্লাহ তাআলা নিজের কথা বুঝাতে 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। এতে কি এ কথা বুঝা যায় না যে, ইসলামে অনেক খোদার ওপর ঈমান রাখা যায়?

আল্লাহ শব্দের বহুবচন নেই

উত্তর : ইসলাম সম্পূর্ণভাবে তাওহীদের নির্দেশদাতা ধর্ম এবং অবশ্যই এ ব্যাপারে কোনো শিথিলতা নেই। ইসলামের বিধান অনুযায়ী আল্লাহ এক এবং তিনি নিজ গুনাবলিতে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যবিহীন, অর্থাৎ কেউ তার সমকক্ষ নেই। কুরআন শরীফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশির ভাগ স্থানে নিজেকে বুঝাতে نَحْنُ অর্থ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মুসলিমগণ বহু খোদায় বিশ্বাস রাখবেন। অনেক ভাষায় বহুবচনের জন্য দু রকম শব্দ ব্যবহৃত হয়।

এক. সংখ্যাগত কালেকশন বা বহুবচনের দ্বারা কোনো বস্তু বা ব্যক্তি একাধিকবার প্রকাশ করতে বহুবচন প্রকাশক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

দুই. বহুবচনের দ্বিতীয় প্রকার হলো যা সম্মানার্থে ব্যবহৃত শব্দ। যেমন ঃ ইংরেজিতে যুক্তরাজ্যে নিজের জন্য আই (I) এর স্থলে 'উই' (We) শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরনের সম্বোধনকে Royal Plural (রাজকীয় বহুবচন) বলা হয়।

- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হিন্দিতে বলতেন, هَم (হাম) অর্থাৎ 'আমি দেখব'। উর্দু এবং হিন্দিতে هَم (হাম) Royal Plural ধরনের বহুবচন। আরবি ভাষায় যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে নিজের কথা উল্লেখ করেন তখন বেশিরভাগ স্থানে আরবি نَحْنُ (নাহনু) শব্দ ব্যবহার করেন এবং এটা সংখ্যাগত বহুবচন নয় বরং সম্মানজনক বহুবচনের শব্দ। তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর একটি। এক এবং কেবল প্রকৃত এক মাবুদের অস্তিত্ব এবং তাঁর সাথে কারো সমকক্ষ না হওয়ার কথা কুরআনের বহু স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন : সূরা ইখলাসের ১ নং আয়াতে মহান প্রতিপালক বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ বলুন! ঐ আল্লাহ এক।

প্রশ্ন : মুসলমানগণ আয়াতের মানসুখ (রহিত/স্থগিত) হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস এই যে, কুরআনের কিছু প্রাথমিক আয়াত পরবর্তীতে অবতীর্ণ হওয়া আয়াতের দ্বারা মানসুখ (রহিত) করা হয়েছিল। এর দ্বারা কি এটা বুঝায় না যে, আল্লাহ তাআলা ভুল করেছিলেন, পরবর্তীতে সেটা শুধরে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)?

মহান আল্লাহ ভুলত্রুটি করেন না

উত্তর : আল-কুরআনের সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

অর্থ : আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান।

আরবি آية 'আয়াত' শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, অথবা বাক্য এবং এর দ্বারা ওহীও বুঝানো হয়। এ আয়াতের 'তাশরী' ও 'পথ' দ্বারা কী বুঝায় তা আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, এ সকল আয়াত যা রহিত হয়ে গেছে এর দ্বারা ঐ সকল ওহীকে বুঝানো হয়েছে যা কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন : তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিল -এর মূল আকৃতি– যার পরিবর্তে ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতের বক্তব্য হলো অতীতের ওহীগুলো সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়নি; বরং তার পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম কালাম দেয়া হয়েছে এবং এর দ্বারা এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তে কুরআন এসে গেছে।

দ্বিতীয়ত, যদি আমরা উল্লিখিত আরবি শব্দ দ্বারা কুরআনের আয়াত বুঝি এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ওহী না বুঝি তাহলে এর এই অর্থ হবে যে, কুরআনের কোনো আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত রহিত হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে উত্তম বা অনুরূপ আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। এর দ্বারা এ কথা বলা যায় যে, কুরআনের কিছু আয়াত যা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল তা পরবর্তীতে অবতীর্ণ উত্তম আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমি এ উভয় পদ্ধতির সাথে একমত। কিছু মুসলিম এবং তাদের সাথে কিছু অমুসলিম দ্বিতীয় পদ্ধতির বিষয়ে

এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কুরআনের কিছু প্রাথমিক আয়াত রহিত করা হয়েছিল যা আজ আমাদের ওপর প্রয়োগ হতো না। এজন্য পরবর্তীতে অবতীর্ণ নাসিখ আয়াতগুলোকে সে স্থানে নেয়া হয়েছে। এ দলের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এ আয়াতগুলো পরস্পর বিপরীত। আমরা এর উত্তরও দিব।

কিছু মুশরিক এ অভিযোগ করতো যে, মুহাম্মদ (স) এ কুরআন নিজে রচনা করেছেন। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ আরব মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন–

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا .

অর্থ : বলুন! যদি সকল মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।

এ চ্যালেঞ্জকে হালকা করে পেশ করা হয়েছে সূরা হুদ এর ১৩ নং আয়াতে–

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

অর্থ : তারা কি বলে কোরআন তুমি তৈরি করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরি করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।

আল্লাহ এ পরীক্ষা আরো সহজ করে সূরা ইউনুসের ৩৮ নং আয়াতে বলেছেন–

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

অর্থ : মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

এরপর সবচেয়ে সহজ চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۔

অর্থ ঃ এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার– অবশ্য তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর চ্যালেঞ্জকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। এরপর নাযিল হওয়া আয়াতের দ্বারা প্রথমে মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে, যদি পার তবে কুরআনের মতো কোনো কিতাব রচনা করে দেখাও। এরপর মাত্র দশটি সূরার অনুরূপ রচনা করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং সর্বশেষ এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, কুরআনের সূরাগুলোর যেকোনো একটির মতো রচনা করে দেখাও। অর্থাৎ তা কখনো সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনে প্রথম অবতীর্ণ আয়াত যেগুলোকে 'মানসুখ' বলা হয় সেগুলোও আল্লাহর কালামের অংশ এবং ঐগুলোতে বর্ণিত বিধানগুলো আজও সত্য। যেমন কুরআনের বর্ণিত– "রচনা করে নিয়ে এসো কুরআনের মতো একখানা গ্রন্থ, অথবা তার মতো মাত্র ১০টি সূরার অনুরূপ সংস্করণ," অথবা "মাত্র একটি ক্ষুদ্র সূরার অনুরূপ একটি সূরা।" এ চ্যালেঞ্জগুলো বর্তমানেও বহাল আছে। আর পরবর্তী চ্যালেঞ্জ পূর্ববর্তী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সহজ, তবে এগুলোতে কোনো বৈপরীত্য নেই। যদি শেষের চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার যোগ্যতা না থাকে তাহলে বাকি চ্যালেঞ্জগুলোর জবাব দেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ধরুন, আমি একজনের বিষয়ে বললাম, সে এমন মেধাহীন যার, স্কুলে ম্যাট্রিক পাস করার যোগ্যতাও নেই। এরপর আমি এটা বলব যে, সে পঞ্চম শ্রেণীও পাস করবে না। তারপর আমি এটাও বলব যে, সে তো প্রথম শ্রেণীও পাস করবে না। সর্বশেষ আমি এ কথাও বলতে পারি, সে কে.জি.ও পাস করতে পারবে না। যেহেতু স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কে.জি. অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন পাস করা জরুরি তাই আমি একথা বলতেই পারি। অন্যভাবে বলতে গেলে আমি বলব, এ ব্যক্তি এমন মেধাহীন যে,

সে কে.জিও পাস করবে না। আমার চারটি কথাই অন্য একটি কথারও বিপরীত নয়। কারণ যদি কোনো ছাত্র কে.জি. পাস না করে তবে সে প্রথম, পঞ্চম অথবা দশম শ্রেণী কীভাবে পাস করবে? ম্যাট্রিক পাসতো প্রশ্নই আসবে না।

এ সকল আয়াতের সর্বাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে নেশার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে। নেশা সম্পর্কিত এসব আয়াতগুলো পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ধারাবাহিকতার প্রথম দৃষ্টান্ত সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত। এখানে আল্লাহ বলেছেন –

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۔

অর্থ ঃ তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করছে। বলুন, উভয়ের মধ্যে কবীরা গুনাহ ও মানুষের জন্য উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু উভয়ের উপকারিতার চেয়ে গুনাহ অনেক বেশি।।

মাদক এবং অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে পরবর্তী সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۔

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কখনো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু বলো তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারো।

মাদক সম্পর্কে সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা মায়িদার, আয়াত নং ৯০-এ বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۔

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।

আল-কুরআন সাড়ে বাইশ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়। আর এ সময় সমাজের অসংখ্য সংশোধনী ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছে। নতুন বিধানের ওপর লোকজনের আমল করতে সুবিধা হয় সে জনাই পর্যায়ক্রমে সংশোধনী আনা হয়েছে। বস্তুত যেন কোনো সমাজে এক সাথে পরিবর্তন সাধন লোকজনের বিরোধিতা ও বাড়াবাড়ির কারণ হয়ে থাকে। তাই মাদক নিষিদ্ধ করার বিষয়টি তিনটি স্তরে সংঘটিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রথম নাযিলকৃত ওহীতে শুধু বলা হয়েছে– মাদকদ্রব্যের [illegible] ধরনের অপরাধ এবং তার কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে অপকারই বেশি।

এরপরের ওহীতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতে এ কথাও পরিষ্কার হলো যে, মুসলমানদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করার কারণে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে বলা হয়নি যে, রাতে যদি কেউ সালাত না আদায় করে তাহলে নেশা করতে পারবে। এর অর্থ সে চাইলে নেশা করতেও পারে আবার নাও করতে পারে।

তদুপরি কুরআন শরীফে কোনো প্রকারের শিক্ষণীয় বিষয়ের চাপ নেই। যদি এ আয়াতে এ কথা বলা হতো যে, যখন নামায না পড়বে তখন মদ্যপান করবে, তাহলে এটা সরাসরি বিপরীত হতো। মহান রাব্বুল আলামীন যৌক্তিক ও সঙ্গত বাক্য ব্যবহার করেন। সর্বশেষ ৫ নং সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে যে কোনো সময়েই মাদক গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

এ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। যদি এগুলোর মধ্যে বৈপরিত্য থাকত তাহলে একই সঙ্গে এ সবগুলোর আমল করা সম্ভব হতো না। সকল মুসলমানকে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, সে আল-কুরআনের সকল আয়াতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। তাই যখন সে সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াত অনুসারে আমল করবে তখন পূর্ববর্তী সকল আয়াত অনুসারে আমল করা হয়ে যাবে।

ধরুন, আমি বললাম যে, আমি লস এঞ্জেলস-এ নেই, এরপর আমি বললাম, আমি ক্যালিফোর্নিয়াতেও নেই। সর্বশেষ বললাম যে, আমি যুক্তরাষ্ট্রে নেই। একথা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, এ তিন বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। প্রতিটি পরবর্তী বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। অতএব যদি বলা হয় যে, আমি যুক্তরাষ্ট্রে নেই এ কথাটি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে যে, আমি লসএঞ্জেলস-এও নেই এমনকি ক্যালিফোর্নিয়াতেও নেই। এরূপভাবে যখন মাদক গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এসে গেল তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা এবং বড় গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা একবারেই হয়ে গেল।

তাহলে আয়াতের রহিত হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, কুরআনে এ কারণে বৈপরীত্য নেই যে, এক সময়ে কুরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করা সম্ভব হতোনা। যদি এর মধ্যে বৈপরীত্য হয়, তাহলে তা আল্লাহর কালাম হতে পারে না। মহান আল্লাহ সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۔

অর্থ ঃ এরা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না? এ গ্রন্থ যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল দেখতে পেতো।

প্রশ্ন : কুরআনের কিছু সূরা الٓمّٓ । حٰمٓ । يٰسٓ ইত্যাদি দ্বারা কেনো শুরু করা হয়েছে? এর গুরুত্ব কী?

প্রতীকী হরফ অলৌকিকত্বের ইঙ্গিত

উত্তর : الٓمّٓ । حٰمٓ এবং يٰسٓ হরফগুলো 'হরফে মুকাত্তাআত'। আরবি বর্ণমালার এ হরফে তাহাজ্জীতে ২৯টি হরফ রয়েছে এবং কুরআনের ২৯টি সূরা এ সকল হরফ দ্বারা শুরু হয়েছে।

তিনটি সূরার শুরু শুধু এক হরফ দ্বারা হয়েছে

১. ৩৮ নং সূরা ছোয়াদ, صٓ হরফ দ্বারা শুরু হয়েছে।

২. ৫০ নং সূরা কৃফ, قٓ হরফ দ্বারা শুরু হয়েছে।

৩. ৬৮ নং সূরা নূন, نٓ হরফ দ্বারা শুরু হয়েছে।

১০টি সূরা ২টি করে হরফে মুকাত্তাআত দ্বারা শুরু হয়েছে

১. ২০ নং সূরা ত্বহা শুরু হয়েছে طٰهٰ দ্বারা।

২. ২৭ নং সূরা নামল শুরু হয়েছে طٰسٓ দ্বারা।

৩. ৩৬ নং সূরা ইয়াসীন শুরু হয়েছে يٰسٓ দ্বারা।

৪. ৪০ নং সূরা মুমিন শুরু হয়েছে حٰمٓ দ্বারা।

৫. ৪১ নং সূরা হামীম আস-সাজদা শুরু হয়েছে حٰمٓ দ্বারা।

৬. ৪২ নং সূরা শূরা শুরু হয়েছে حٰمٓ দ্বারা।

৭. ৪৩ নং সূরা যুখরুফ শুরু হয়েছে حٰمٓ দ্বারা।

৮. ৪৪ নং সূরা দুখান শুরু হয়েছে حٰمٓ দ্বারা।

৯. ৪৫ নং সূরা জাসিয়াহ শুরু হয়েছে حٰمٓ দ্বারা।

১০. ৪৬ নং সূরা আহকাফ শুরু হয়েছে حٰمٓ দ্বারা।

১৪টি সূরা আরম্ভ হয়েছে তিন হরফ দ্বারা

১. ২ নং সূরা বাকারা শুরু হয়েছে الٓمٓ দ্বারা।

২. ৩ নং সূরা আলে ইমরান শুরু হয়েছে الٓمٓ দ্বারা।

৩. ১৪ নং সূরা আনকাবুত শুরু হয়েছে الٓمٓ দ্বারা।

৪. ৩০ নং সূরা রূম শুরু হয়েছে الٓمٓ দ্বারা।

৫. ৩১ নং সূরা লুকমান শুরু হয়েছে الٓمٓ দ্বারা।

৬. ৩২ নং সূরা আস-সাজদা শুরু হয়েছে الٓمٓ দ্বারা।

৭. ১০ নং সূরা ইউনুস শুরু হয়েছে الٓر দ্বারা।

৮. ১১ নং সূরা হুদ শুরু হয়েছে الٓر দ্বারা।

৯. ১২ নং সূরা ইউসুফ শুরু হয়েছে الٓر দ্বারা।

১০. ১৪ নং সূরা ইবরাহীম শুরু হয়েছে الٓر দ্বারা।

১১. ১৫ নং সূরা হিজর শুরু হয়েছে الٓر দ্বারা।

১২. ২৬ নং সূরা শুআরা শুরু হয়েছে طسٓمٓ দ্বারা।

১৩. ২৮ নং সূরা কাসাস শুরু হয়েছে طسٓمٓ দ্বারা।

দুটি সূরা চার হরফ মুকাত্তাআত দ্বারা শুরু হয়েছে

১. ৭ নং সূরা আরাফ শুরু হয়েছে الٓمٓصٓ দ্বারা।

২. ১৩ নং সূরা রাআদ শুরু হয়েছে الٓمٓر দ্বারা।

দুটি সূরা পাঁচ হরফ দ্বারা শুরু হয়েছে

১. ১৯ নং সূরা মারইয়াম শুরু হয়েছে كٓهيعٓصٓ দ্বারা।

২. ৪২ নং সূরা শূরা শুরু হয়েছে দু রকম حمٓ عسٓقٓ দ্বারা।

এ সকল হরফের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোর দিয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি। মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে অধিকাংশের অভিমত হলো–

- এ হরফগুলো কিছু বাক্য বা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। الٓمٓ এর উদ্দেশ্য আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ;

  এ হরফগুলো সংক্ষিপ্ত রূপ নয় বরং আল্লাহ তাআলা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম অথবা চিহ্ন।

- এ হরফগুলো কাফিয়া বন্দী (প্রারম্ভিক বর্ণমালা) করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
- এ হরফগুলোর সংখ্যাগত মর্যাদাও আছে, কেননা সিরিয়ার ভাষায় বিভিন্ন অক্ষর বিভিন্ন সংখ্যার মর্যাদা সম্পন্ন।
- হযরত মুহাম্মদ (স)ও তাঁর পরবর্তী শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এ হরফগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।
- এ হরফগুলোর অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েক খণ্ড (কিতাব) লেখা সম্ভব।

বিভিন্ন আলিমগণ যে তাশরীআত বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা, যার গুরুত্ব ইমাম ইবনে কাসীর, আল্লামা জামাখশারী এবং ইবনে তাইমিয়াহ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ–

- মানুষের দেহ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত। মাটি তার মৌলিক গঠনের উপাদান। কিন্তু এ কথা বলা সঠিক নয় যে, মানুষ সম্পূর্ণ মাটির মতো। মানুষ যে সকল উপাদান দ্বারা তৈরি তা সম্পর্কে আমরা অবগত; মানবদেহ যে সকল উপাদান দ্বারা গঠিত হয়েছে সেগুলোকে একত্র করে তাতে আমরা যদি কয়েক গ্যালন পানি ঢালি তবুও এর মধ্যে জীবন দিতে পারব না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি, মানবদেহে কোন্ কোন্ উপাদান রয়েছে। এ সকল বস্তু থাকা সত্ত্বেও আমাদের যখন জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন অপারগতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। এরূপভাবে যখন কুরআনে ঐ সকল লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা আল্লাহর বিধানকে মানে না, তখন কুরআন তাদের বলে যে, এ কিতাব তোমাদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা ঐ ভাষা যার বাগ্মীতার ব্যাপারে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অহংকার প্রকাশ করতো। আরবগণ নিজ ভাষার ব্যাপারে অনেক বড়াই করতো এবং কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালে আরবি ভাষা উচ্চ মার্গে অবস্থান করছিল।

হরফে মুকাত্তায়াত যেমন– الٓمٓ ، يسٓ ، حمٓ ইত্যাদি ব্যবহার করে মানুষের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, যদি এ কুরআন সঠিক এবং আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তাহলে এর মতো বা এর একটি সূরার মতো আরেকটি সূরা লিখে আনো। প্রথমে কুরআন সকল জিন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, তুমি কুরআনের মতো কালাম এনে দেখাও, পরে আবার বলেছে, তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করেও কখনো এ কাজ করতে পারবে না। এ চ্যালেঞ্জ ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ নং আয়াত ও ৫২ নং আয়াত, সূরা তুর-এর ৩৪ নং আয়াতে প্রদান করা হয়েছে।

অতঃপর এ চ্যালেঞ্জ ১১ নং সূরা হূদ-এর ১৩ নং আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এরূপ ১০টি সূরা বানিয়ে দেখাও। এরপর ১০ নং সূরা ইউনুস -এর ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো এবং সর্বশেষ ২ নং সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۔

অর্থ : আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন কর, তোমরা যদি সত্যবাদী হও। তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। আর যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনোই তা করতে পারবে না, তবে ঐ আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে তার জ্বালানি, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

▶ হিজাজবাসীর দক্ষতার মোকাবিলা করার জন্য আলোচ্য নমুনা পেশ করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে এ দুটির উত্তর দেয়া হয়েছে। আরবি ভাষার সকল কিছু এ হরফে মুকাত্তায়াত-এর মধ্যেই। কুরআনের স্বাভাবিক মুজিজা শুধু এই নয় যে, তা আল্লাহ তাআলারই বাণী বরং এর মহত্ত্ব এও যে, এগুলো ঐ হরফ যা নিয়ে মুশরিকরা অহংকার করতো। কিন্তু তারা এর মোকাবিলায় কোনো বাক্য উপস্থাপন করতে পারেনি। আরবগণ নিজেদের বাগ্মীতা, ভাষার অলঙ্কারের ওপরে পাণ্ডিত্য অর্জনের ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ ছিল, যেমনটা আমরা জানি দেহের উপাদান কোন্ কোন্ জিনিস, আমরা তা জোগাড়ও করতে পারি। এরূপভাবে কুরআনের অক্ষর الم -ও তারা জানতো এবং শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে তারা তা ব্যবহারও করতো, কিন্তু যেরূপভাবে দেহের উপাদানসমূহ জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাতে জীবন দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এরূপভাবে আমরা কুরআনের বাগ্মীতা ও তার বাণীর সৌন্দর্যের বিষয়াদি আয়ত্তে আনতেও সক্ষম নই।

সুতরাং আল-কুরআন নিজেই এ কথার প্রমাণ যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী এবং এজন্যই সূরা বাকারার প্রথমে হরফে মুকাত্তাআত এর পর তৎক্ষণাৎ যে আয়াত তাতে কুরআনের অলৌকিকত্ব এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার

বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন–

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۔

অর্থ : এই সেই কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। (সূরা বাকারা আয়াত– ২)।

প্রশ্ন : কুরআনে আছে যে, জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ বানানো হয়েছে। এ থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, জমিন (ভূমি) চ্যাপ্টা এবং সমতল। এ কথা কি গ্রহণীয় আধুনিক বিজ্ঞানের মূল সত্যের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে না?

জমিনকে বিছানা বলা বিশেষ অর্থবহ

উত্তর : প্রশ্নে পবিত্র কুরআনের ৭১ নং সূরা নূহ-এর ১৯ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন–

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۔

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে এ জমিনকে বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন।

কিন্তু এ আয়াতে বাক্যটি পূর্ণ হয়নি। পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কার করা হয়েছে। সূরা নূহ-এর ২০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۔

অর্থ : যেন তোমরা এর বুকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারো।

এরূপভাবে এ কথা সূরা ত্বহার ৫৩ নং আয়াতে পুনরায় বলা হয়েছে–

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۔

অর্থ : যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য বহু ধরনের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন।

জমিনের উপরিস্তরের পুরুত্ব তেইশ মাইলেরও কম এবং এর তুলনা জমিনের অর্ধাংশের ওপর ধরা হয়, যার দৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে ৩.৭৫ মাইল। তাই জমিনের পুরুত্ব খুবই পাতলা মনে হবে। জমিনের অভ্যন্তর প্রচণ্ড গরম, তরল এবং যে কোনো প্রকারের জীবনযাপনের জন্য অসম্ভব স্থান। জমিনের উপরিস্তর গোলাকৃতির

ঐ গোলকের মতো যার ওপরে আমরা জীবন যাপন করছি। এজন্য কুরআন এটাকে সম্পূর্ণ সঠিকরূপে বিছানা অর্থাৎ, 'قَالِين' এর সাথে তুলনা করেছে, যাতে আমরা এর পথের ওপর চলাফেরা করি। কুরআনের মধ্যে এমন কোনো আয়াত নেই যাতে এ কথা বলা হয়েছে যে, জমিন চ্যাপ্টা অথবা সমতল। কুরআন শুধু ভূমির উপরের স্তরটিকে সমতল 'قَالِين' (বিছানা) এর সাথে তুলনা করেছে। কিছু লোক মনে করে, 'কালীন' কেবল সমতল ভূমির ওপর বিছানো হয়। পাহাড়ি ভূমিতে যেমন বড় পাথরের ওপরও বিছানা বিছানো সম্ভব এবং অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভূমির গ্লোব-এর আকারের বড় নমুনা নিয়ে তার ওপর বিছানা বিছিয়ে আরাম করা যায়। বিছানা সাধারণভাবে এমন আকৃতির পাটাতনের ওপর বিছানো হয়, যার ওপর আরামে চলা যায়। কুরআন জমিনের উপরিস্তরের উল্লেখ বিছানার সাথে করেছে যার নিচে গরম, তরল ও জীবনযাপন অসম্ভব। বিছানা জমিনের ওপর বিছানো, 'কালীন' ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য কুরআনের এ বক্তব্য শুধু যুক্তির আলোকেই নয় বরং এর মধ্যে এমন এক সত্য বর্ণিত হয়েছে যার ভূমি বিষয়ক অভিজ্ঞতা আছে এমন লোক অনুধাবন করতে পারে। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, জমিনকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরা যারিয়াত-এর ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَـٰهَا فَنِعْمَ الْمَـٰهِدُونَ ۔

অর্থ ঃ আমি এই জমিনকেও তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কতো সুন্দরই না বিছিয়ে থাকি।

এমনভাবে কুরআনের বহু আয়াতে জমিনকে খোলা বিছানা বা চাদর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন সূরা নাবার ৬, ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَـٰدًا ۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۔

অর্থ ঃ আমি কি জমিনকে বিছানা ও পাহাড়কে পেরেকস্বরূপ বানাইনি!

কুরআনের এ আয়াতে কোন ধরণের ইঙ্গিতও করা হয়নি যে আমি জমিনকে চ্যাপ্টা বা সমতল বানিয়েছি। শুধু এটা পরিষ্কার হয় যে, জমিন খোলা ও প্রশস্ত এবং এর কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনকাবুতের ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَـٰعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّـٰىَ فَاعْبُدُونِ ۔

অর্থ ঃ হে আমার বান্দারা যারা আমার ওপর ঈমান এনেছো, আমার জমিন অনেক প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।

প্রশ্ন : এ কথা কি ঠিক নয় যে হযরত মুহাম্মদ (স) কুরআনকে বাইবেল থেকে নকল করেছেন?

কুরআনের রচয়িতা মহান আল্লাহ

উত্তর : বেশির ভাগ সমালোচনাকারী এ কথা বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (স) এ কুরআন নিজে লেখেননি; বরং সকল মানব সৃষ্টি উৎস থেকে অথবা খোদা প্রদত্ত পূর্বের কিতাব থেকে নকল করেছেন। তারা এ ধরণের অভিযোগ করে।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর এ অভিযোগ আরোপ করে যে, তিনি মক্কা মুযাফাতে অবস্থানকারী এক রোমান ধর্মযাজকের নিকট থেকে কুরআন শিখেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) অনেক সময় তার কাজ-কর্ম দেখতে যেতেন। কুরআনের একটি আয়াতই এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট।

জবাবে সূরা নাহল-এর ১০৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۔ لِّسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ۔

অর্থ ঃ হে নবী! আমি ভালো করেই জানি যে, এরা বলে এ কুরআন তো একজন মানুষ এসে এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়, যে ব্যক্তিটির দিকে এরা ইঙ্গিত করে এর ভাষা আরবি নয়, আল কুরআন হচ্ছে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা।

তাহলে ঐ ব্যক্তি যার মাতৃভাষা বিদেশি, যে বিশুদ্ধভাবে আরবি বলতে পারে না, যে আধো আধো আরবি বলতে পারে তিনি কীভাবে কুরআনের উৎস হতে পারেন যা বিশুদ্ধ, সুন্দর বর্ণনা, সুমধুর ভাষা উচ্চতম আরবি ভাষায় রচিত!

মুহাম্মদ (স) কোনো বিদেশির কাছ থেকে কুরআন শিখেছেন এমন কথা বলা আর কোনো ব্যক্তি যে বিশুদ্ধভাবে ইংরেজি ভাষাও জানে না তার শেক্সপিয়রকে ইংরেজী ভাষা শেখানোর কথা বলার শামিল।

এমনও বলা হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (স) হযরত খাদিজা (র) এর আত্মীয় ওরাকা বিন নওফেল থেকে কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সম্পর্ক ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদের সাথে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল। হযরত মুহাম্মদ (স) যে খ্রিস্টানের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যোগাযোগ রাখতেন তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ ব্যক্তি যার নাম ওরাকা বিন নওফেল। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (র) এর চাচাতো ভাই। তিনি আরবিভাষী হলেও নিজে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নতুন ধর্ম সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর সাথে তাঁর দু'বার সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথমবার
বাইতুল্লায় ইবাদত করছিলেন, তখন তিনি আন্তরিকতার টানে হযরত মুহাম্মদ (স) এর কপালে চুম্বন করেছিলেন। দ্বিতীয়বার হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে যখন তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে যান। এর তিনবছর পর ওরাকার ইন্তিকাল ঘটে। অথচ কুরআন অবতীর্ণ হয় প্রায় তেইশ বছর পর্যন্ত। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ওরাকা বিন নওফেলকে ওহীর উৎস ভাবা সম্পূর্ণ হাস্যকর এবং মূল্যহীন।

দ্বিধাহিন চিত্তে এ কথা স্বীকার্য যে, হযরত মুহাম্মদ (স) এর সাথে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু এসব তো হয়েছে মদিনায়, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার তেরো বছরেরও অধিককাল পরে। তাহলে বলা যায়, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা কুরআনের উৎস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল এবং বিরক্তিকর অভিযোগ এনেছে এজন্য যে, হযরত মুহাম্মদ (স) ঐ সব বিতর্কে একজন শিক্ষক ও মুবাল্লিগের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাদের বলতেন, আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নিয়ে তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে এসো। তাদের মধ্যে অনেক ইহুদি-খ্রিস্টানই পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, নবুওয়তের ঘোষণার আগে হযরত মুহাম্মদ (স) মাত্র তিনবার মক্কার বাইরে সফরে গিয়েছিলেন।

প্রথমবার, নয় বছর বয়সে তিনি ইয়াসরিবে (মদিনা) নিজ মাতার ঘরে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার, নয় থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে নিজ চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফর করেন।

তৃতীয়বার, ২৫ বছর বয়সে হযরত খাদিজা (রা) এর ব্যবসায়িক মালপত্র নিয়ে সিরিয়া যান।

এ তিনটি সফরে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে গতানুগতিক কথা-বার্তা ও সাক্ষাৎ হয়েছে। এগুলোকে ভিত্তি করে কুরআনের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়, আসলে এর মতো ভিত্তিহীন এবং অসম্ভব চিন্তা আর কী আছে! হযরত মুহাম্মদ (স) ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কাছ থেকে কখনোই কুরআন শেখেননি। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সমগ্র জীবন একটি উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় এবং প্রকৃত ঘটনা হলো হযরত মুহাম্মদ (স) কে নিজ ঘরে পরবাসীর স্থান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা হুজুরাত এর ৪ ও ৫ নং আয়াতে বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۔

অর্থ ঃ যারা হুজরার পিছন থেকে উচ্চঃস্বরে আপনাকে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত তবে তা তাদের জন্য কতই উত্তম হত! আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

কাফিরদের মতে, যারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে শেখাতেন; আর যদি হযরত মুহাম্মদ (স) ঐ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তাহলে ওহীর যে ধারা তাতে এ কথা বেশি দিন গোপন থাকত না। কুরাইশদের অনেক স্বনামধন্য সরদার হযরত মুহাম্মদ (স) কে অনুসরণ করে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাদের মেধা এতোই তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স) যে ওহী পেশ করতেন তার মধ্যে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকতো, তাহলে সহজেই তারা সেগুলো চিনে ফেলতে পারতেন এবং এতে খুব একটা সময় লাগতো না। হযরত মুহাম্মদ (স) এর দাওয়াত ও আন্দোলন ২৩ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কারোরই সামান্য সময়ের জন্য সন্দেহ জাগেনি। হযরতের এ প্রচারের বিরোধীরা সবসময় তাঁর পেছনে এ উদ্দেশ্যে লেগেছিল যে তারা হযরত মুহাম্মদ (স) কে মিথ্যা প্রমাণিত করবে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একটি সাক্ষ্যও হাজির করতে পারেনি যে তিনি কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টানদের সাথে গোপন সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। এমন চিন্তার অবকাশ নেই যে, কোনো ব্যক্তি এ কথা মেনে নেবে যে তিনি কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করবেন অথচ তার কৃতিত্ব নিজে নেবেন না। এজন্য যুক্তি এবং ঐতিহাসিকভাবে 'কুরআন মানবসৃষ্ট' এ কথা মানা যায় না। হযরত মুহাম্মদ (স) নিজে কুরআন লিখেছেন অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে নকল করেছেন এ কথা ঐতিহাসিকভাবে এ কারণে ভুল যে, হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে সূরা আনকাবুতের ৪৮ নং আয়াতে এ কথার সত্যায়ন করেছেন–

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۔

অর্থ ঃ আপনি ইতিপূর্বে কোনো কিতাব পড়েননি, আপনি নিজ হাতে লিপিবদ্ধও করেননি যে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করবে।

বহু লোক কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহপোষণ করবে এবং
মুহাম্মদ (স) এর সাথে সম্পৃক্ত করবে, মহান আল্লাহ এ কথা অবগত ছিলেন। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা এক নিরক্ষরকে তাঁর সর্বশেষ নবী করে পাঠালেন যেনো বাতিল পূজারীদের হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর সন্দেহের অবকাশ না থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিরোধীরা বলতে পারেন না যে, তিনি অন্য উৎস থেকে কুরআনের বিষয় আয়ত্ত করে একে সুন্দর আরবিতে রূপান্তর করে নিয়েছেন, এ কথায় কিছু পক্ষপাত ও অসারতা রয়েছে। কিন্তু উল্টো এ ধরনের আপত্তি এই অবিশ্বাসী ও সন্দেহ পোষণকারীদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা আরাফ এর ১৫৭ নং আয়াতে এ কথার সত্যায়ন করে বর্ণনা করেন–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ

অর্থ ঃ যারা এই বার্তাবাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করে চলে, যার উল্লেখ তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়।

উম্মী নবীর আগমনের বার্তা বাইবেলের 'ইসাইয়াহ' গ্রন্থের ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে–

▶ "পুনরায় ঐ কিতাব তাকে দিব যিনি লেখা-পড়া জানেন না, তাকে বলা হবে, পড়ো। তিনি বলবেন, আমি লেখা-পড়া জানি না।"

কুরআন শরীফে কমপক্ষে চার স্থানে এ কথার সত্যায়ন করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। এ সম্পর্কে সূরা আরাফের ১৫৮ নং আয়াত এবং সূরা জুমুআর ৬ নং আয়াতেও স্পষ্ট বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সময়ে আরবিতে বাইবেল ছিল না। পাদ্রি R. Saadeas Gaon ৯০০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ওল্ড টেস্টামেন্টের যে আরবি অনুবাদ করেন তা ছিল মুহাম্মদ (স) এর ওফাতের প্রায় ২৫০ বছর পরের ঘটনা। আর ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে আরপেনিয়াস (Erpenius) নিউ টেস্টামেন্টের সর্বপ্রথম যে আরবি অনুবাদ করেন তা রাসূল (স) এর ওফাতের প্রায় এক হাজার বছর পর। কুরআন এবং বাইবেলে এমন একটি বক্তব্যও নেই যা দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে বাইবেল থেকে কুরআন নকল করা হয়েছে। মূলত এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে বিষয়টি কোনো তৃতীয় শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সকল আসমানী কিতাবের উৎস একটি সত্তা সকল সৃষ্টির প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। ইহুদি খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ও তার পূর্বের আসমানি

কিতাবগুলো মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে আংশিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং সংরক্ষিত অংশের সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মিল রয়েছে। এ কথাও সত্য যে, কুরআন এবং বাইবেলের মধ্যে কিছু বিষয়ের মিল আছে, কিন্তু এ ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর এ অভিযোগ উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই যে তিনি তিনি বাইবেল থেকে কিছু নকল করেছিলেন অথবা এখান থেকে গ্রহণ করে কুরআনের আয়াত বা সূরাগুলো বিন্যাস করেছেন। যদি এ অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে এ অভিযোগ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপরও ফিরে আসে এবং তাদের ওপর এ দাবিও করা যায় যে, ঈসা মসীহ (আ) সত্য নবী ছিলেন না এবং তিনি ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নকল করেছিলেন। কুরআন এবং বাইবেল সম্পর্কে একটা কথাই সঠিক যে মূলত এর উৎস এক। দুটি কিতাবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা ধারাবাহিকতা, তবে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে পরবর্তী নবীগণ পূর্ববর্তী নবীগণ থেকে নকল করেছেন। যদি কোনো ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে তাহলে নিশ্চয়ই সে নিজ শিক্ষকের নিকট এ কথা লিখবে না যে আমি আপনার কাছে বসে অমুক ছাত্রের কাছ থেকে নকল করেছি। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীর সম্মান বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনেও এ কথা বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের ওপর আল্লাহ তাআলা সহীফা নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে প্রধান চার কিতাবের উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানগণ এসব কিতাবের ওপর ঈমান রাখে। কুরআনে উল্লেখিত এসব কিতাবগুলো হলো–

তাওরাত : এটি হযরত মুসা (আ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

যাবুর : এটি হযরত দাউদ (আ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

ইঞ্জিল : এটি হযরত ঈসা (আ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

কুরআন : সর্বশেষ কিতাব যা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, সকল নবী এবং আল্লাহ প্রদত্ত সকল আসমানি কিতাবের ওপর ঈমান আনা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয। আজকের বাইবেলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী কিছু কিছু থাকতে পারে। তবে অবশ্যই তা মূল অবস্থায় নেই। এটা পূর্ণাঙ্গভাবে নেই এবং এর মধ্যে নবীদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া বাণীও নেই।

পবিত্র কুরআন সব নবীর বিষয়ে একটি ধারা নির্ধারণ করে দিয়েছে এ [illegible] বলেছে, এদের নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এক এবং একই ছিল মৌলিক বাণী। এ ভিত্তির ওপর কুরআন এ কথা প্রমাণ করে যে নবীদের কালের অনেক পার্থক্য থাকলেও বড় বড় ধর্মের মৌলিক শিক্ষা পরস্পর বিরোধী নয়। এর কারণ হলো, এদের সকলের উৎস একই এবং প্রকৃত উৎস হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। এজন্য কুরআন এটা বলে যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যায়, তার দায়িত্ব নবীদের ওপর বর্তায় না। বরং এর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁদের অনুসারীদের ওপর, যারা শিখিয়ে দেয়া এক অংশ ভুলে গিয়েছিল। এছাড়াও তারা আল্লাহর কিতাবে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল এবং এর পরিবর্তন করেছিল। অতএব কুরআন সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না যে এটা এমন কিতাব যা হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং অন্যান্য নবীর শিক্ষার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে এই কিতাব পূর্ববর্তী নবীদের বার্তাকে জোরালো ও সত্যায়ন করে। তাকে পরিপূর্ণ করে এবং তাকে পূর্ণতায় পৌছায়।

পবিত্র কুরআনের আরেক নাম 'ফুরকান'। যার অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী পাল্লা বা মাপকাঠি। কুরআনের আলোকে আমরা এটা জানতে পারি পূর্বের আসমানি কিতাবগুলোর কোন কোন্ অংশ আল্লাহ তাআলার বাণী। কুরআন এবং বাইবেল অধ্যয়ন করলে আপনারা এমন অনেক বিষয় পাবেন যাতে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু এগুলো যাচাই করলে বোঝা যাবে তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিষ্টান ও ইসলামের কোনো শিক্ষার ওপর গভীর জ্ঞান রাখেন না এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা করা কঠিন হবে যে উভয় কিতাবের মধ্যে কোন্টা সঠিক। হ্যাঁ, আপনি যদি উভয়ের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে পরখ করেন তবে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে মূল কোন্টা। আপনার সামনে সত্য উন্মোচিত করে দেবে কয়েকটি উদাহরণ।

বাইবেলের 'সৃষ্টি কিতাব'-এর প্রথম অধ্যায়ে এ কথা লেখা আছে যে, পৃথিবী সৃষ্টিতে ছয় দিন লেগেছে, প্রতিদিনের সময়কাল ছিল চব্বিশ ঘণ্টার। কুরআনেও এ কথা বলা হয়েছে যে, পৃথিবী ছয় দিনে (أيام) সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু কুরআন অনুসারে এ يوم যুগ (বারো বছর) এর ওপর শামিল এবং অন্য কথায় এর দ্বারা এক ধারা বা এক দাওরা/চক্কর অথবা এক যুগ বোঝায়। যা যথেষ্ট দীর্ঘকাল। যখন আল কুরআন বলে, এ পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে; এর দ্বারা আসমানসমূহ এবং

জমিনকে ছয়টি দীর্ঘ চক্কর বা যুগে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের এ কথার ওপর কোনো আপত্তি নেই। সৃষ্টি জগৎ সৃজনে বহু বছর লাগে এবং এ কথা বাইবেলের চিন্তার সাথে বৈপরিত্যপূর্ণ। যাতে বলা হয়েছে, সৃষ্টিজগত মাত্র ছয় দিনে তৈরি হয়েছে বা ধরা হয়েছে যে দিন মাত্র ২৪ ঘণ্টায়।

বাইবেলের 'সৃষ্টি কিতাব'-এ লেখা আছে− আলো, দিন এবং রাত সৃষ্টি জগতের প্রথম দিনে তৈরি করা হয়। 'মহান ঈশ্বর সবার আগে জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন ছিল বিরাণ ও শূন্য তার উপরে অন্ধকার ছিল এবং ঈশ্বরের রূহ পানির ওপর ছিল এবং ঈশ্বর বললেন, আলো হয়ে যাও এবং আলো হয়ে যায় এবং আল্লাহ দেখলেন আলো সুন্দর হয়েছে এবং ঈশ্বর আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন, আল্লাহ আলোকে দিন ও অন্ধকারকে রাত হতে বলেন। সন্ধ্যা হলো এবং ভোর হলো এরূপে প্রথম দিন শুরু হলো।"

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, সৃষ্টি জগতের ঘূর্ণনের আলো ছিল তারকাগুলোর মধ্যে এক প্রকারের পেছানো আলোকের কারণে। যদিও বাইবেল বলে− "সূর্য, চাঁদ এবং তারকাগুলোর জন্ম হয় চতুর্থ দিনে।"

মহান ঈশ্বর দুটি বড় বড় আলোদানকারী সৃষ্টি করেন। একটি হলো বড়− যে দিনের শাসন করে, অন্যটি হলো ছোট যে রাতের শাসন করে। তিনি তারকাগুলোকে সৃষ্টি করেন এবং এদের আসমানের ওপর রাখেন, যাতে এগুলো জমিনে আলো ফেলতে পারে। রাত ও দিনের ওপর শাসন করে এবং আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করে। আল্লাহ দেখলেন যে, সুন্দর সকাল শুরু হলো এবং সন্ধ্যা হলো, ভোর হলো এভাবে চতুর্থ দিন হলো।"

এটা যুক্তি বিরোধী যে, আলোদানকারী সূর্য তিনদিন পর সৃষ্টি হলো এবং দিন রাতের ধারাবাহিকতা যা সূর্যের আলোর কারণে হয়, প্রথম দিন সৃষ্টি করলেন। আর দিনের অঙ্গ অর্থাৎ, ভোর ও সন্ধ্যার ধারাবাহিকতা সূর্যকে কেন্দ্র করে জমিনের ঘূর্ণনের পরে সম্ভব, কিন্তু বাইবেলের বক্তব্য অনুযায়ী ভোর ও সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়েছিল সূর্য সৃষ্টির তিন দিন পূর্বে।

পক্ষান্তরে আল-কুরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিষয়ে কোনো অবৈজ্ঞানিক কালক্রমের বর্ণনা নেই। সুতরাং বলতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) এ বিষয়ে বাইবেল থেকে কিছু নকল করেছিলেন− এ ধরনের অযৌক্তিক ও অদূরদর্শী বক্তব্য প্রদান করা সম্পূর্ণ ভুল ও হাস্যকর। বাইবেল এ কথা বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে আলো বিকিরণ করে, যেমন− সৃষ্টি কিতাবের পরের শ্লোকে প্রমাণিত এবং সেখানে সূর্য ও চন্দ্রকে যথাক্রমে বড় আলোদানকারী ও ছোট আলোদানকারী হিসেবে চিহ্নিত করা

হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী চাঁদের নিজের কোনো আলো
শুধু সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। আল কুরআন এ কথা সত্য বলে প্রমাণ করে। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত مُنِيْر (মুনীর) বা চাঁদ শব্দটির অর্থ হলো– আলোকে প্রতিবিম্বকারী এবং এটা যে আলো দেয় তা আসে প্রতিবিম্ব দ্বারা। এটা মনে করা কি উচিত যে হযরত মুহাম্মদ (স) বাইবেলের এ বৈজ্ঞানিক ভুলকে সংশোধন করে কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের প্রথম অধ্যায়ের ১১ থেকে ১৩ নং শ্লোকে রয়েছে– সবজি, বীজ বহনকারী শস্যাদি এবং ফলদানকারী বৃক্ষ তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল এবং একই অধ্যায়ে ১৪ থেকে ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সূর্যকে চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী কীভাবে এটা সম্ভব যে বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে সূর্যের উত্তাপ ছাড়া গাছপালা জন্ম লাভ করল? অভিযোগ উত্থাপনকারী অমুসলিমদের কথা অনুযায়ী যদি হযরত মুহাম্মদ (স) সত্যিই কুরআনের লেখক হতেন এবং তিনি যদি বাইবেল থেকে কোনো কিছু নকল করতেন তাহলে কীভাবে তিনি অবৈজ্ঞানিক অংশ বাদ দিলেন যেহেতু কুরআনে বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে বিরোধপূর্ণ কোনো কথা নেই। বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ) থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বর্ণনাকৃত বংশধারা অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে হযরত আদম (আ) আজ থেকে ৫৮০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর এবং হযরত ইবরাহীম (আ) এর মাঝে ১৯৪৮ বছরের পার্থক্য। হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ঈসা (আ) এর মাঝে প্রায় ১৮০০ বছরের ব্যবধান এবং হযরত ঈসা (আ) থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবধান ২০০০ বছরের। এ সময়ের ইহুদি ক্যালেন্ডারও প্রায় ৫৮০০ বছরের পুরাতন যার শুরু সৃষ্টির শুরু থেকে। প্রাচীন নিদর্শন ও নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, প্রথম মানব জন্ম নিয়েছিলেন আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে। আল কুরআন মোতাবেকও যিনি পৃথিবীতে প্রথম পা রাখেন অর্থাৎ হযরত আদম ও (আ) তখন এসেছিলেন। কিন্তু বাইবেলে কোনো তারিখ বর্ণনা করা হয়নি এবং এমন কোনো বর্ণনা নেই যে তিনি পৃথিবীতে কতোদিন ছিলেন। বাইবেলের বর্ণিত বিষয়াবলি বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলির সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের ৬,৭ ও ৮ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, নূহ (আ)-এর প্লাবন ছিল বিশ্বব্যাপী যা ভূমিতে বসবাসরত সকল জীবের জীবনাবসান ঘটিয়েছিল তা মানুষ বা প্রাণী অর্থাৎ, পা-বিশিষ্ট প্রাণী বা পা-বিশিষ্ট পাখি সব খতম হয়ে গিয়েছিল। শুধু নূহ (আ)-এর কিশতি বা নৌকায় আরোহীরা জীবিত ছিলেন।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হযরত আদম (আ)-এর জন্মের ১৬৫৬ সাল পরে; অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মের ২৯২ বছর পূর্বে যখন হযরত নূহ (আ)-এর বয়স ২০০ বছর ছিল। অর্থাৎ, এ প্লাবন হযরত ঈসা (আ)-এর ২১ অথবা ২২ শতক পূর্বের। বাইবেলে বর্ণিত ঘটনা সমূহ অতীত ঐতিহ্য ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের বিপরীত। যার ফলে এ কথা প্রমাণিত যে, এ সকল শতকে মিশরের ১১তম রাজবংশ ও ব্যাবিলনের ২য় রাজবংশ কোনোরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই শাসন করছিল। সেখানে এ ধরনের প্লাবন হয়নি। বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বব্যাপী প্লাবনের তথ্যের বিপরীতে কুরআনে হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবনের যে ঘটনা বলা হয়েছে তা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রত্নতত্ত্বের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। কারণ–

- আল কুরআন এ ঘটনার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা বছর উল্লেখ করেনি।
- আল কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্লাবন বিশ্বব্যাপী ছিল না। তাই সকল প্রকারের প্রাণী নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এ তথ্যটি সঠিক নয়।

অর্থাৎ এ কথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে, এ প্লাবনের ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (স) বাইবেল থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ঘটনাকে কুরআনে বর্ণনা করার সময় ভুলগুলোও সংশোধন করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে আল কুরআন এবং বাইবেলে হযরত মূসা (আ) এবং ফিরাউনের যে ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর অনেক পারস্পরিক মিল রয়েছে। উভয় কিতাবে এ কথা পর্যন্ত মিল রয়েছে যে, ফিরআউন হযরত মূসা (আ)-কে অনুসরণ করে এবং মূসা (আ) এর পর রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করার সময় ডুবে মরে, আর মূসা (আ) বনী ইসরাঈল লোকদের সাথে পার হয়ে যান। আল-কুরআনের সূরা ইউনুসের ৯২ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে– فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

অর্থ ঃ আজ আমি শুধু তোমার দেহকেই বাঁচিয়ে রাখবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকতে পারো।

পরিপূর্ণ বিশ্লেষণের পর ড. মরিস বুকাইলি এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ফিরাউন দ্বিতীয় রামাসীস নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী সে বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম করেছে। কিন্তু মূলত হযরত মূসা (আ)-এর মাদইয়ানে আশ্রয় নেয়ার সমসাময়িক সময়ে তিনি মারা যান। দ্বিতীয় রামাসীসের পুত্র মুনফাতাহ-এরপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সে ইহুদিদের মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বাহীরা কলযমে ডুবে যায়। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের ওয়াদী এলাকায়

মুনফাতাহর লাশের প্রদর্শনী হয়। ১৯৭৫ সালে ড. মরিস বুক[illegible] বিশেষজ্ঞদের সাথে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এর যে ফলাফল তিনি লাভ করেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুনফাতাহ জলমগ্ন হয়ে অথবা কঠিন আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। এজন্য এটা কুরআনের আয়াতের অনেক বড় অবদান যে, 'আমি শিক্ষার জন্য তার লাশকে রক্ষা করব।' ফিরাউনের লাশ উদ্ধারের মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। লাশটি বর্তমানে কায়রোতে অবস্থিত মিসর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। কুরআনের এ আয়াত এক সময়ে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ড. মরিস বুকাইলিকে কুরআন অধ্যয়ন করতে বাধ্য করে। পরবর্তীকালে তিনি 'বাইবেল, কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স' নামক বইটি লেখেন এবং স্বীকার করেন যে, কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কিতাব নয়। ড. বুকাইলি পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এসব দলিল এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, কুরআন বাইবেল থেকে নকল করা হয়নি। বরং কুরআন তো 'ফুরকান' অর্থাৎ এটা এমন দাঁড়িপাল্লা যা দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। এটা দ্বারা বাইবেলে কোন্ অংশ আল্লাহর বাণী তা চিহ্নিত করা সহজ হবে। সাজদা ১ থেকে ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الٓمّٓ ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۔ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۔

অর্থ : আলিফ-লাম-মীম। সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই এই কিতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারা কি একথা বলতে চায় যে এ কিতাব সে ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে? না, বরং এ হচ্ছে তোমার প্রভুর নিকট থেকে সত্য (অবতারিত) যাতে এর দ্বারা তুমি এক জাতিকে ভীতি প্রদর্শন কর যাদের প্রতি তোমার পূর্বে কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। আশা করা যায় তারা হিদায়াত লাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন : কুরআন কি আল্লাহর কালাম নাকি শয়তানের কাজের বিবরণ?

কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর কালাম

উত্তর : গোঁড়া প্রকৃতির পশ্চিমা লেখক ও পাদ্রীগণ এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ উপস্থাপন করে। এ ধরনের অভিযোগ মক্কার কাফিররাও করতো যে, হযরত মুহাম্মদ (স) শয়তানের পক্ষ থেকে ঐশী অনুপ্রেরণা পান। এ ব্যাপারে সহীহ বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ের সূরা আদদুহা-এর ৪৯৫০ নং হাদীসে উল্লেখ আছে, জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত- একবার হযরত মুহাম্মদ (স) অসুস্থ হয়ে

পড়েন। এ জন্য তিনি দু'রাত সালাতে তাহাজ্জুদ আদায় করেননি। এ সময়ে এক মহিলা এসে রাসূল (সা)কে বলল, 'হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমার কাছে আসা ছেড়ে দিয়েছে। আমি দু-তিন রাত তাকে তোমার কাছে আসতে দেখি না।' এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। সূরা আদদুহা -এর ১-৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

وَالضُّحٰى ۔ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۔

অর্থ : শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাতের, যখন তা ছেয়ে যায়; আপনার প্রভু আপনাকে ছেড়েও যান নি, আপনার ওপর অসন্তুষ্টও হননি।

এরপরে সূরা ওয়াকিয়া আয়াত নং ৭৭ থেকে ৮০ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۔ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۔ لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۔ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থ : অবশ্যই কুরআন এক মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি সযত্নে রক্ষিত গ্রন্থে লিখিত, পূত পবিত্র ব্যতিরেকে কেউ তা স্পর্শ করে না। সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত।

এখানে 'কিতাব মাকনুন' অর্থ এমন কিতাব যা সংরক্ষিত ও নিরাপদ এবং এর দ্বারা আসমানের ওপর 'লাওহে মাহফুজ'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পবিত্রগণ ছাড়া এর ওপর কেউ হাত লাগায় না। এর অর্থ সকল প্রকার নাপাকি এমনকি বদ জ্বিনও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শয়তান কুরআন স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি তার কাছেও আসতে পারে না। তাহলে প্রশ্নই ওঠে না যে, সে কুরআনের আয়াত লিখেছে। সূরা শোয়ারার ১০ নং আয়াত থেকে ২১২ নং আয়াত পর্যন্ত মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ۔ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ۔

অর্থ : এ কুরআন কোনো শয়তান নাযিল করেনি। ওরা এ কাজের যোগ্যও নয়, না তারা তেমন ক্ষমতা রাখে, তাদের তা শোনারও অধিকার নেই।

শয়তানের ব্যাপারে বহুলোক ভুল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তাদের ধারণা শয়তান শুধু আল্লাহর জিম্মায় যে কাজ থাকে তা ছাড়া সকল কাজ করে। তাদের ধারণা ইচ্ছা

পূরণ ও ক্ষমতায় শয়তান আল্লাহর থেকে কম নয়। এ লোকেরা মানতে

যে, আল কুরআন মুজিযা এবং রূহানি। তাই তারা বলে যে এটা শয়তানের কাজ। এর জবাব রয়েছে পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ৯৮ নং আয়াতে–

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

অর্থ ঃ অতঃপর তোমরা যখন কুরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

পবিত্র কুরআনের আয়াতেই প্রমাণ আছে যে এ কিতাব শয়তানের নয়। সূরা আরাফের ২০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ . إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

অর্থ ঃ কখনো যদি শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, সাথে সাথেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও, অবশ্যই তিনি সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

সুতরাং শয়তান কেমন করে নিজ অনুসারীদের বলে যে, যখন তাদের মগজে কোনো কুমন্ত্রণা আসে, তখন সে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পানাহ চাইবে, যে তার প্রকাশ্য দুশমন?

সূরা ইয়াসীনের ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন–

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

অর্থ ঃ হে আদম সন্তান! আমি কি বলিনি তোমরা শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

ভয় পাবার কিছু নেই যে শয়তান অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে কিছু লোকের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, শয়তান কুরআন লিখেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অসীম শক্তির মোকাবিলায় কোনো সাহস শয়তানের নেই এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি শয়তানকে অপছন্দ করেন, এজন্য তিনি কুরআন অধ্যয়ন করার সময় এমন ভূমিকা রাখতে বলেছেন যাতে প্রমাণ হয় যে, এটা কুরআন আল্লাহর কালাম এবং কখনো শয়তানের লিখিত নয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র ইঞ্জিল এর মিরাকস-এ আছে–

'যদি কোনো রাজত্বে ফুট (সমস্যা) পড়ে তাহলে তা কায়েম থাকবে না, যদি কোনো ঘরে ফুট পড়ে তাহলে সে ঘরও টিকে থাকবে না। যদি শয়তান নিজের

বিরোধিতায় ফুট নিয়ে নেয় তাহলে সেও কায়েম থাকবে না বরং সে শেষ হয়ে যাবে।"

এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, শয়তান নিজের বিপরীত এমন কিতাব লিখবে যা নিজের মূল কেটে দেবে। এ কারণে কুরআনের ব্যাপারে মক্কার কাফির, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের এ অভিযোগ মৌলিকভাবে বিরোধী ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন : কুরআনের কয়েক স্থানে বলা হয়েছে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। আবার এর সাথে এ কথাও বলেছেন যে তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। আসলে তিনি কি ক্ষমাশীল নাকি শাস্তিদাতা?

আল্লাহ অসীম গুণের অধিকারী

উত্তর : আল কুরআনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ খুবই দয়াশীল। আল কুরআনের ৯ নং সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরা পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে– بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ দ্বারা শুরু হয়েছে। আল কুরআনের সূরা নিসা'র ২৫ নং আয়াতে ও সূরা মায়িদা'র ৭৪ নং আয়াতে এবং আরো বহু স্থানে সংশ্লিষ্ট অবস্থায়- وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, অর্থ ঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়; বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আবার তিনি অনেক কঠোর। যে লোক শাস্তির উপযুক্ত তাকে শাস্তিও দেন। আল কুরআনে কয়েক স্থানে নিজ অবস্থান ব্যাখ্যায় আল্লাহ এটাও বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অমুসলিম ও কাফিরদের কঠিন শাস্তি দেবেন। তিনি তাদের শাস্তি দেবেন যারা তাঁর নাফরমানি করবে। কয়েকটি আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির কথা বর্ণিত আছে যা দোযখে নাফরমানদের দেয়া হবে।

সূরা নিসার ৫৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا . كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا .

অর্থ ঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের অচিরেই আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, অতঃপর যখন পুড়ে চামড়া গলে যাবে, তখনই আমি তার বদলে নতুন চামড়া গজিয়ে দিব, যাতে তারা আযাব ভোগ করতে পারে। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কৌশলী।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল নাকি শাস্তি দানকারী? এ বিষয়টি অবশ্যই লক্ষণীয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমাশীল, দয়াময়; সাথে সাথে শাস্তির যোগ্য, খারাপ আমলকারী এবং খারাপ লোকদের জন্য কঠিন শাস্তিদাতা। তিনি ন্যায়বিচারক। তাইতো ৪ নং সূরা নিসার ৪০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এক অণু পরিমাণ জুলুমও করেন না।

সূরা আম্বিয়ার ৪৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

অর্থ : কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় বিচারের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করব, অতঃপর সেদিন কারো ওপরই কোনো রকম জুলুম করা হবে না। যদি সামান্য সরিষার দানা পরিমাণ আমলও থাকে আমি এনে হাজির করব। হিসাব নেওয়ার জন্য আমিই যথেষ্ট।

পরীক্ষায় নকলকারী কোনো ছাত্রকে কি কোনো শিক্ষক এমনি ছেড়ে দেবেন? কোনো ছাত্রকে যদি পরীক্ষায় নকলরত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং পরীক্ষক হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাহলে কি শিক্ষক এ কথা বলেন যে, সে বড়ই অসহায়? এবং ওই ছাত্রকে নকল করার সুযোগ দেবেন? যদি তাই হয় তবে শিক্ষকের এমন কাজ অন্য ছাত্রদেরও নকল করার প্রতি উৎসাহিত করবে। যদি শিক্ষক এরূপ করেন এবং দয়াশীল হন তাহলে ছাত্ররা পড়াশুনা করবে না এবং তারা নকল করে পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করবে। সকল ছাত্রই 'এ' গ্রেডে বিশেষ মানে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং কর্মজীবনে ব্যর্থ হবে আর পরীক্ষার সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সূরা মূলক-এর ২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে আমলের দিক দিয়ে উত্তম হতে পারে?

আল্লাহ যদি সব মানুষকে ক্ষমা করে দেন এবং কাউকে শাস্তি না দেন, তাহলে মানুষ কেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্য স্বীকার করবে? আমি স্বীকার করছি যে, এ অবস্থায়

কোনো লোক হয়তো জাহান্নামে যাবে না, তবে অবশ্যই পৃথিবীটা জাহান্নামে পরিণত হবে। আবার যদি এ কথা প্রচার হয়ে যায় যে, সব মানুষই জান্নাতে যাবে, তাহলে মানুষের এ দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য আর কী থাকলো? এ অবস্থায় দুনিয়ার জীবন আর আখিরাতের পরীক্ষাগার হিসেবে থাকবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু তওবাকারীকেই ক্ষমা করবেন না বরং তাকে ক্ষমা করবেন যে নিজ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং তওবা করেছে।

সূরা যুমার-এর ৫৩ থেকে ৫৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۔

অর্থ : বলুন! হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো, আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অতএব, তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আযাব আসার পূর্বেই। (কেননা আযাব এসে গেলে) অতঃপর তোমাদের আর কোনো সাহায্য করা হবে না। তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিত আযাব নাযিল হবার পূর্বেই তোমাদের মালিকের নাযিলকৃত গ্রন্থের অনুসরন কর।

তবে মনে রাখবেন, অনুতপ্ত হওয়ার ও তওবার শর্ত চারটি। সেগুলো হলো :

১. এ কথার ওপর একমত হওয়া যে, একটি খারাপ কাজ করে ফেলেছে।

২. এ কাজ থেকে তৎক্ষনাৎ ফিরে আসা।

৩. পরবর্তীতে কখনো এ পাপ না করা।

৪. যদি এ কাজের দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন : আল কুরআনে বলা হয়েছে, মায়ের গর্ভে যে বাচ্চা তার সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানতে পারেন। কিন্তু আজ বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে এবং আমরা সহজেই আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে বাচ্চার ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়া সম্পর্কে জানতে পারছি তাহলে কুরআনের আয়াত কি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়?

'লিঙ্গ' নয় 'প্রকৃতি' সম্পর্কে বলা হয়েছে

উত্তর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সকল বিষয়ে জানেন ও খবর রাখেন। তিনি কিছু বিষয়ে মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু সকল দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কেবল তাঁরই এখতিয়ারে। কিছু লোক এটা বুঝেছেন, আল কুরআন এ দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলাই শুধু মায়ের উদরে যে সন্তান আছে তা ছেলে না মেয়ে সে সম্পর্কে জানেন। আল কুরআনের সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ . وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ . وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ . إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

অর্থ ঃ অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের আগমন জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন যা গর্ভাশয়ে বিদ্যমান আছে। কোনো মানুষই বলতে পারে না আগামিকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন।

বর্তমানে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে সহজে মায়ের উদরের সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যাচ্ছে। একথা ঠিক যে, এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অনুবাদের মধ্যে এ কথাও বলা হয়েছে যে, শুধু আল্লাহই জানেন মায়ের গর্ভস্থিত বাচ্চা ছেলে না মেয়ে। কিন্তু মূল আরবি অনুসরণে আপনি এ আয়াতের বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন যে, ইংরেজি শব্দ Sex-এর কোনো আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়নি। মূলত কুরআনে যা বলা হয়েছে তাহলো গর্ভে যা আছে তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে। অনেক তাফসীরকারকদের ভুল হয়েছে, তারা এর অর্থ এটা বুঝেছেন যে, আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভের বাচ্চার সেক্স বা লিঙ্গ সম্পর্কে জানেন। এ কথা ঠিক নয়, এখানে লিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং ইঙ্গিত এ দিকে যে, মাতৃগর্ভের বাচ্চার প্রকৃতি কী হবে। সে কি স্বীয়

পিতা-মাতার বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ হবে নাকি দুর্ভাগ্যের? সে কি সমাজের জন্য করুণার কারণ হবে নাকি শাস্তির? সে কি সৎ হবে নাকি অসৎ? সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে? এ সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই। দুনিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এমন উন্নত হয়নি যার দ্বারা এ সকল প্রশ্নের সমাধান করতে পারে।

প্রশ্ন : কুরআনে আছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট একদিন এক হাজার বছরের সমান। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কুরআনের এ সকল বক্তব্য কি পরস্পর বিরোধী ইঙ্গিত করে না?

মহাজাগতিক ও সৌর সময়সীমা ভিন্ন

উত্তর : পবিত্র কুরআনের সূরা সাজদা, ছাড়াও ২২ নং সূরা হাজ্জে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট যে দিন তা আমাদের হিসাবে এক হাজার বছরের সমান। যেমন সূরা সাজদার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ .

অর্থ ঃ আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সব কিছুকে তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুকে তিনি ওপরের দিকে নিয়ে যাবেন একদিন যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে, একদিন তোমাদের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সূরা মায়ারিজ-এর ৪ নং আয়াতে–

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ .

অর্থ ঃ ফেরেশতাগণ ও রূহ আল্লাহর দিকে আরোহণ করবে এমন একদিন যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

উল্লেখিত আয়াতের সাধারণ অর্থ এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সময়ের পরিমাণ পৃথিবীর মতো নয়। তিনি এর দৃষ্টান্ত জমিনের এক হাজার অথবা পঞ্চাশ হাজার বছর দ্বারা দিয়েছেন। অন্য কথায়, আল্লাহ তাআলার নিকট যে একদিন তা জমিনের হাজার হাজার দিন অথবা তার চেয়েও অধিক হতে পারে। এ সকল আয়াতে আরবি يوم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ একদিন, আবার দীর্ঘ সময়, এ

ছাড়া যুগও হয়। যদি يوم -এর অর্থ যুগ (Period) করেন তাহলে ... সন্দেহ জাগবে না।

সূরা হাজ্জের ৪৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.

অর্থ ঃ এরা তোমার নিকট আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে, আল্লাহ কখনো তার ওয়াদার খেলাপ করেন না, তোমার প্রভুর নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।

কাফিররা যখন বলতে থাকলো, আযাব প্রদানে কেনো বিলম্ব হচ্ছে এবং তা কেনো শীঘ্রই আসছে না– তখন কুরআন জবাব দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যাপারে অক্ষম নন। তোমাদের কাছে সময়ের যে ব্যাপ্তি এক হাজার বছরের, তা আল্লাহর নিকট মাত্র এক দিনের। সূরা সাজদায় বর্ণনা করা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নিকট সবকিছু পৌছাতে আমাদের হিসাবে এক হাজার বছরের সময় লাগে। সূরা মায়ারিজের বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায় যে, ফেরেশ্‌তা রূহুল কুদস এবং সকল রূহের আল্লাহ তাআলার নিকট পৌছাতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সময় লাগে। এটা অবশ্যই নয় যে, দু'ধরনের কাজের ব্যবস্থা করতে এক রকম সময় লাগবে। যেমন আমাদের এক স্থানে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগে, আবার অন্যত্র যেতে পঞ্চাশ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এ দ্বারা কখনো এ কথা বোঝায় না যে আমি বিপরীতমুখী কথা বলছি। এভাবে আল কুরআনের আয়াতগুলোর একে অপরের বিপরীত নয় বরং এটা বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন : কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা। আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে কীভাবে প্রমাণ করবেন, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?

মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি

উত্তর : কুরআনে কারীমে মানুষকে তুচ্ছ বস্তু থেকে সৃষ্টির ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এ কথা বলা হয়েছে যে, সে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্ট। এ কথা বহু আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন সূরা কিয়ামাহর ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ

অর্থ ঃ সে কি এক ফোঁটা স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

কুরআনের বহু স্থানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। সূরা হাজ্জ এর ৫ নং আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ.

অর্থ ঃ হে মানুষ, পুনর্জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

সাম্প্রতিককালে আমরা জেনেছি, মানবদেহের উপাদানসমূহে কম-বেশি কিছু পরিমাণ মাটি অন্তর্ভুক্ত আছে। এ বিষয়ে কুরআনের একাধিক আয়াতে বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত আছে যেখানে বলা হয়েছে, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল কুরআনের কিছু আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে বীর্যের ফোঁটা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অপর কিছু আয়াতে এটাও বলা হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। এ উভয় কথার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। বৈপরীত্য তাকে বলে যা পরস্পরবিরোধী অর্থাৎ, এক সময়ে দুটি সত্য হতে পারে না। কুরআনে কিছু স্থানে বলা হয়েছে মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন সূরা ফুরকানের ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا.

অর্থ ঃ তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

বিজ্ঞান এ তিনটি বক্তব্যই সত্যায়ন করে। মানুষকে বীর্য, মাটি ও পানি এ তিন জিনিস দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। ধরুন, আমি বললাম, এক কাপ চা তৈরি করতে প্রথমে পানি ব্যবহৃত হয়। তারপর চায়ের পাতা এবং দুধ অথবা পাউডারও লাগে। এ দুই বক্তব্য বিপরীত নয়। কারণ চা তৈরির জন্য পানি এবং পাতা দুটোই প্রয়োজন। আর যদি আমি মিষ্টি চা বানাতে চাই তাহলে চিনিও লাগবে। সুতরাং কুরআন যখন বলে মানুষকে বীর্য, মাটি অথবা পানি থেকে বানানো হয়েছে, তাহলে এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং সমন্বয় আছে। Contradistinction বা পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এক বিষয়ের ওপর দু'ধরনের ধারণার বিষয়ে কথা বলা যা পরস্পর বিপরীত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি বলি মানুষ সর্বদা সত্য কথা বলে এবং এর স্বভাব মিথ্যার। তাহলে এটা বিপরীত বক্তব্য হবে। তবে যদি বলি মানুষ দ্বীনদার, দয়ালু এবং ভালোবাসাসম্পন্ন, তাহলে এটা হবে দুই বিভিন্ন গুণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা।

প্রশ্ন : কুরআনে কয়েক স্থানে এ কথা বলা হয়েছে যে, জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সূরা ফুসসিলাত বা হামীম আসসিজদায় বলা হয়েছে, জমিন এবং আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে ৮ দিনে। এটা কি কুরআনের বৈপরিত্য নয়? এ আয়াতে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জমিন ছয় দিনে তৈরি হয়েছে পুনরায় আসমান দু'দিনে তৈরি করা হয়েছে। এরূপ বলা Big Bang-এর বিপরীত ; যার কথা হলো আসমান জমিন একই সময়ে অস্তিত্বে এসেছিল।

আল্লাহ-ই সময়জ্ঞানে যথার্থ জ্ঞানী

উত্তর : আমি এ কথার সাথে একমত যে, আল কুরআনের বর্ণনানুযায়ী আসমান এবং জমিন ছয় দিনে দ্বিতীয় কথায় ছয় চক্করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল-কুরআনের নিচের আয়াতগুলোতে এর উল্লেখ রয়েছে-

৭ নং সূরা আরাফ-এর ৫৪ নং আয়াত,

১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৩ নং আয়াত,

১১ নং সূরা হুদ-এর ৭ নং আয়াত,

২৫ নং সূরা ফুরকান-এর ৫৯ নং আয়াত,

৩২ নং সূরা সাজদা-এর ৪ নং আয়াত,

৫০ নং সূরা ক্বাফ-এর ৩৮ নং আয়াত,

৫৭ নং সূরা হাদীদ-এর ৪ নং আয়াত,

কুরআনের ঐ আয়াতগুলো, যেগুলোর ব্যাপারে আপনার ধারণা হলো যে আসমান ও জমিন আট দিনে সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো সূরা ফুসসিলাত বা হামীম আসসাজদা, যার সূরা নং ৪১, আয়াত নং ৯ থেকে ১২ তে বলা হয়েছে-

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۔ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۔ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۔ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۔ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۔

অর্থ : বলুন! তোমরা কি তাকে অস্বীকার করতে চাও, যিনি দু'দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা অন্য কাউকে কি তাঁরই সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চাও? অথচ তিনিই সারা সৃষ্টির পালনকর্তা। তিনিই এ জমিনের মাঝে ওপর থেকে পাহাড়সমূহকে স্থাপন করে দিয়েছেন এবং তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে সবার আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন চার দিন সময়ের ভেতর। অনুসন্ধানীদের জন্য সবই সমান। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ বিশেষ। এরপর তিনি তাকে ও জমিনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসো ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, তারা উভয়েই বলল, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি। অতঃপর তিনি দুই দিনের ভেতর এ (সেই ধূম্রকু)-কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার আদেশনামা পাঠালেন। পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিলাম এবং (জ্বিন ও শয়তান থেকে) সুরক্ষিত করলাম। এ সকলই পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ মহামহিমের নির্ধারণ।

আল কুরআনের এ আয়াতগুলো প্রকাশ্যে এটাই বলছে যে, আসমান-জমিন আট দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ আয়াতগুলোর শুরুতে বর্ণনা করেছেন– ঐসব লোক এ সকল বাক্যের নির্দিষ্ট অংশের বর্ণনাকৃত তথ্যের এবং সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য ভুল অনুধাবন/ব্যাখ্যা পেশ করে। আসলে তারা কুফরী প্রচারের ইচ্ছা রাখে এবং আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের এটাও বর্ণনা করেন যে, কিছু কাফির এমনও আছে, এই প্রকাশ্য বৈপরীত্যের ভুল অনুধাবন ব্যাখ্যা পেশ করবে। যদি আপনি মনোযোগ ও বিবেচনার সাথে এ আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হবে যে, এখানে জমিন এবং আসমানের দুই পৃথক সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড় ব্যতীত জমিনকে দুই দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং চার দিনে পাহাড়গুলোকে জমিনের ওপর শক্ত করে স্থাপন করা হয়েছে এবং জমিনে বরকত রাখা হয়েছে এবং এতে প্রলেপ প্রদান ও রিযক দেয়া হয়েছে। এজন্য ৯ এবং ১০ নং আয়াত অনুযায়ী পাহাড়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ ও ১২ নং আয়াতে আছে, বাকি দিনগুলোতে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ নং আয়াতের শুরুতে ثم শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ 'পুনরায়' বা 'আবার' অথবা 'উক্ত ব্যতীত'। কুরআনের কিছু অনুবাদে এর অর্থে 'অতঃপর' লেখা হয়েছে এবং এরপর 'ব্যতীত' অর্থে নেয়া হয়েছে। যদি এর সঠিক অনুবাদ অনুধাবন করতে ভুল হয় তাহলে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে সব মিলে আট দিন

গণ্য হবে এবং এ কথা হবে কুরআনের দ্বিতীয় আয়াতের বিপরীত, ... হয়েছে, আসমান জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও এ আয়াত ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতেরও বিপরীত হবে। যাতে এটা বলা হয়েছে যে, জমিন ও আসমানকে একই সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে এ আয়াতে ثُمَّ শব্দটি সঠিক অনুবাদ হবে 'এটা ব্যতীত' অথবা 'এর সাথে'। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী সঠিক অনুবাদ 'Moreover' করেছেন যাতে এটা পুরোপুরি স্পষ্ট হয় যে, একই সময়ে পাহাড় ও জমিন ইত্যাদি ছয় দিনে জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে একই সময়ে এর সঙ্গে দুদিনে আসমানগুলোকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য সকল কিছুর সৃষ্টি 'আট' নয় 'ছয়' দিনে হবে। ধরুন, একজন রাজমিস্ত্রি বললো, দশতলা দালান এবং তার চার দেওয়াল ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবে এবং এর সমাপ্তির পরে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বললো, বিল্ডিং এর মূল কাঠামো দু'মাসের মধ্যে হয়েছে এবং দশ তলার গঠন চার মাসে হয়েছে এবং যখন কাঠামো ও মূল বিল্ডিং এক সাথে সমাপ্ত করলো সেই সাথে বিল্ডিং এর চার দেয়ালের কাজও শেষ করেছে তাতে দু'মাসের সময় লেগেছে। এ কথার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য নেই। বরং দ্বিতীয় বর্ণনায় বিল্ডিং এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আল কুরআনের কয়েক স্থানে সৃষ্টিকুলের সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে। কোথাও سَمٰوٰتٌ ও الْاَرْضُ বলা হয়েছে, কোথাও الْاَرْضُ ও سَمٰوٰتٌ শব্দাবলিও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ২১ নং সূরা আম্বিয়ায় ৩০ নং আয়াতে 'Big Bang' -এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আসমান ও জমিনকে এক সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় –

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۔ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

অর্থ ঃ এ কাফিররা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও জমিন (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি, আমি প্রাণবন্ত সবকিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এসব জানার পরও কি তারা ঈমান আনবে না?

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۔ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۔

অর্থ ঃ তিনি সেই মহান সত্তা যিনি এ পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন। সাথে সাথে তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সাত আসমান তৈরির কাজকে সুষম করলেন। তিনি সকল কিছু সম্পর্কে অবগত।

এ আয়াতে ثُمَّ -এর তরজমা 'অতঃপর' করি, তাহলে এ আয়াত আল কুরআনে অন্য কিছু আয়াতের এবং 'Big Bang' এর বিপরীত হয়ে যায়। এজন্যই ثُمَّ -এর সঠিক তরজমা 'সাথে সাথে' অথবা 'একই সাথে' করতে হবে।

প্রশ্ন : আল কুরআনে একটি আয়াত রয়েছে যাতে এ কথা এসেছে যে, আল্লাহ দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব-এর মালিক। আপনি এ কুরআনের আয়াতের কী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেশ করবেন?

বৈজ্ঞানিকভাবে আয়াতের অর্থই সঠিক

উত্তর : আল্লাহ তাআলা দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব। পবিত্র কুরআনের সূরা আর রাহমানের ১৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

অর্থ : দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব।

আরবিতে مَشْرِق এবং مَغْرِب শব্দদ্বয়ের দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে; এর মানে হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব। ভূগোল ও বিজ্ঞান থেকে আমরা এ তথ্য জানতে পারি যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। কিন্তু এর উদয়স্থল সারা বছর পরিবর্তন হতে থাকে। বছরে দুবার ২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর বসন্ত ও শরতের মাঝে সূর্য সম্পূর্ণ পূর্ব দিক থেকে উদয় হয় অর্থাৎ, মকরক্রান্তির ওপর পরিভ্রমণ করে। বাকি দিনগুলোতে সম্পূর্ণ পূর্ব থেকে কিছুটা উত্তর বা দক্ষিণ দিক থেকে উদয় হয়। গ্রীষ্মকালে ২২ জুন সূর্য পূর্বের এক প্রান্ত থেকে কর্কটক্রান্তির ওপর পরিভ্রমণ করে উদিত হয়। শীত মওসুমেও একদিন ২২ ডিসেম্বর পূর্বের দ্বিতীয় প্রান্ত মকরক্রান্তির ওপর পরিভ্রমণ করে উদিত হয়। এভাবে সূর্য গ্রীষ্মে ২২ জুন এবং শীতে ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমের দুটি ভিন্ন স্থানে অস্ত যায়। প্রকৃতির এ দৃশ্য কোনো শহরের লোক সহজে দেখতে পারে অর্থাৎ, কেউ উঁচু বিল্ডিং থেকে উদয় ও অস্তের এ দৃশ্য দেখতে পায়।

আপনি দেখবেন যে, সূর্য গ্রীষ্মে ২২ জুন পূর্বের এক প্রান্ত থেকে উদিত হয় এবং শীতে ২২ ডিসেম্বর অন্য প্রান্ত থেকে উদিত হয়। সংক্ষেপে বললে, সূর্য সারা বছর পূর্বের বিভিন্ন স্থান থেকে উদিত হয় এবং পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে অস্তমিত হতে

থাকে। এ জন্য আল কুরআন যখন আল্লাহ তাআলার উল্লেখ দুই [illegible] পশ্চিমের রব হিসেবে করে তখন তার এ উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্ব-পশ্চিমের দুই প্রান্তের সংরক্ষক ও মালিক। শব্দ ও ওজনের দিক থেকে আরবিতে বহুবচনের দুটি সীগাহ। এক– তাসনিয়া অর্থাৎ দুই-এর জন্য। দুই-জমা অর্থাৎ দুই এর অধিক এর জন্য। সূরা আর রাহমানের ১৭ নং আয়াতে مشرقين এবং مغربين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা দ্বি-বহুবচনের শব্দ। এর উদ্দেশ্য দুই মাগরিব ও দুই মাশরিক। সূরা মায়ারিজের ৪০ নং আয়াতে আছে-

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.

অর্থ : কখনোই নয়। আমি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।

এ আয়াতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য مَشْرِق ও مَغْرِب শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে এবং দু'য়ের অধিক প্রকাশ করছে। এ থেকে আমরা এ ফলাফল বের করতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে উল্লেখ্য সকল পূর্ব-পশ্চিমের স্থানগুলোর প্রতিপালক (رَبُّ) ও মালিক হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব-পশ্চিমের দুই শেষ প্রান্তেরও মালিক এবং রব।

প্রশ্ন : আল কুরআন যখন মুসলমানদের বলে, যেখানে কাফিরদের পাও হত্যা কর; তাহলে ইসলাম কি কাঠিন্য, খুন খারাবি এবং পশুত্বের সুযোগ দেয়?

ভুল ব্যাখ্যায় কুরআন দায়ী নয়

উত্তর : কুরআনের কিছু বিশেষ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যার দ্বারা এমন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগকে সাহায্য করে এবং নিজ অনুসারীদের বলে, ইসলামের বহির্ভূত লোকদের হত্যা কর। এ ধারাবাহিকতায় সমালোচকরা ৯ নং সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের উল্লেখ করে, যাতে এর দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় যে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ, খুন-খারাবি এবং পশুত্বের সুযোগ দেয়। আয়াতে বলা হয়েছে –

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

অর্থ : তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ওপর দোষারোপ করার জন্য এ আয়াতের উল্লেখ আসল

উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। আয়াতের মূল বিষয় অনুধাবনের জন্য সূরাটি প্রথম আয়াত থেকে পাঠ করা আবশ্যক। এতে মুসলমান এবং মুশরিকদের মাঝে যে নিরাপত্তা চুক্তি ছিল তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ চুক্তি শেষ করার জন্য আরবে শিরক এবং মুশরিকদের অস্তিত্ব কার্যত আইন বিরুদ্ধ– এ স্বীকৃতি লাভ করে। কারণ রাজ্যের অধিকাংশের ওপর ইসলামের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ কারণে এছাড়া আর কোনো পথ ছিল না যে, হয়তো লড়বে নয়তো রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। এ দ্বারা ইসলামের রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা শক্ত ও মজবুত করার প্রয়োজন ছিল। মুশরিকদের নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চার মাসের জন্য সময় দেয়া হয়েছিল।

সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতে রয়েছে-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ : অতঃপর নিষিদ্ধ মাস শেষ হওয়ার পর মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায কায়েম করে যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আমরা জানি, এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। ধরুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা আমেরিকার জেনারেল যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার সৈন্যদের বললেন, যেখানেই ভিয়েতনামীদের পাও তাদের হত্যা কর। আমি এ কথাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা জেনারেল এ কথা বলেছেন যে, যেখানে ভিয়েতনামীদের পাও সেখানে তাদের হত্যা কর– তাহলে এমন মনে হবে যে, আমি কোনো কসাই-এর কথা উল্লেখ করছি। কিন্তু আমি যদি এ কথাকে উপযুক্ত উদ্দেশ্য অনুসারে বর্ণনা করি তাহলে এটা যৌক্তিক মনে হবে। কেননা আসলে যুদ্ধের দিনে তিনি নিজ সৈন্যের সাহস বাড়ানোর জন্য হুংকারের মতো নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, যেখানে শত্রু পাও তাদের হত্যা কর। যুদ্ধ সমাপ্তির পর ঐ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এরূপ ৯ নং সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর।' এ নির্দেশ যুদ্ধের অবস্থায় অবতীর্ণ হয় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যদের উদ্দীপনা বাড়ানো। কুরআন মূলত

মুসলমান সৈন্যদের এ কথা বলছিল যে, সে যেন ভীত না হয় এবং য... সামনে শত্রু পড়বে তাদের হত্যা করবে।

উল্লেখ্য, অরুন শূরী ভারতে ইসলামের কঠিন সমালোচক হিসেবে গণ্য। তিনিও নিজ পুস্তক 'ফাতওয়া দুনিয়া'-এর ৫৭২ পৃ. সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের বরাত দিয়েছেন। এ আয়াতের বরাত দেওয়ার পর তিনি হঠাৎ ৭ নং আয়াতে পৌঁছে গেছেন। সকল বুদ্ধিমান মানুষই এটা বুঝতে পারে যে, তিনি জেনে বুঝে ৬ নং আয়াত থেকে লাফ দিয়েছেন। ৬ নং আয়াতে আল্লাহ এ অভিযোগের সান্ত্বনাদায়ক উত্তর দিয়েছেন। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : যদি মুশরিকদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি আপনার নিকট আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দিন, যাতে আল্লাহর বাণী সে শুনতে পায়। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। কারণ তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়।

পবিত্র কুরআন শুধু এটাই বলে না যে, যদি কোনো মুশরিক যুদ্ধকালীন আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দাও বরং তাকে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশও দান করে। হয়তো বর্তমানে যুদ্ধরত কওমের মধ্যে একজন দয়াবান এবং নিরাপদকামী জেনারেল যুদ্ধ চলাকালীন শত্রু সৈন্যদের নিরাপত্তা চাওয়ার কারণে জীবন বাঁচাবে কিন্তু এমন কোনো জেনারেল কি আছেন যিনি নিজ সৈন্যদের এ কথা বলবেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন কোনো সৈন্য নিরাপত্তা চাইলে তাকে শুধু ছেড়েই দেবে না বরং নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেবে?'

প্রশ্ন : হিন্দু পণ্ডিত অরুন শূরী এ দাবি করেছেন যে, আল-কুরআনে হিসাবে একটি ভুল রয়েছে। তার বক্তব্যে সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকারের অংশগুলো যদি যোগ দেয়া হয় তাহলে সংখ্যা একের অধিক হয়। তাহলে কি কুরআনের রচয়িতা গণিত জানে না?

কুরআনের উত্তরাধিকারের হিসাব সঠিক

উত্তর : উত্তরাধিকারের বিধান কুরআনে বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

সূরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াত,

সূরা বাকারার ২৪০ নম্বর আয়াত,

সূরা নিসার ৭ থেকে ৯ নং আয়াত,

সূরা নিসার ১৯ এবং ৩৩ নং আয়াত,

সূরা মায়িদাহ্-এর ১০৫ এবং ১০৮ নং আয়াত।

তবে অংশীদারের অংশের ব্যাপারে সূরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ নং আয়াতে পুরোপুরি স্পষ্ট বিধানাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত সূরা নিসার আয়াত ১১ এবং ১২ বিশ্লেষণ করা যাক যার বরাত অরুন শূরী দিয়েছেন। কুরআন বলেছে-

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۔ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۔ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۔ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۔ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۔ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۔ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে আদেশ করেন; এক পুত্রের অংশ হবে দুই কন্যার অংশের সমান। তবে যদি শুধু কন্যা দু'জনের অধিক থাকে তাহলে তাদের জন্য ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তবে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতা ওয়ারিশ হয়, তাহলে মা পাবেন তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে মা পাবেন ছয় ভাগের এক ভাগ। এসব অংশ মৃত ব্যক্তির কৃত অসিয়ত অথবা গৃহিত ঋণ পরিশোধ করার জন্য সাব্যস্ত হবে। তোমাদের পিতৃকুল ও তোমাদের সন্তানকুলের মধ্যে উপকারে কারা তোমাদের নিকটতম ব্যক্তি, তা তোমরা জান না। এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। (আয়াত-১১)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۔ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۔ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۔ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۔ غَيْرَ مُضَارٍّ ۔ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۔

অর্থ ঃ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে তাহলে তোমরা অর্ধেক পাবে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ পাবে। এ বন্টন ব্যবস্থা মৃতের অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর গৃহিতব্য। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তবে তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ। এ সব ব্যবস্থা তোমাদের কৃত অসিয়ত পূরণ করার ও ঋণ পরিশোধ করার পর গৃহিতব্য।

যদি কোনো ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন পুরুষ অথবা নারী হন এবং তাঁর এক বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা এক বৈপিত্রেয় বোন উত্তরাধিকারী থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তারা যদি এর অধিক হয় তবে সবাই তিন ভাগের এক ভাগে সম অংশীদার হবে। এটা হবে মৃত ব্যক্তির কৃত অসিয়ত পূরণ করার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর; কিন্তু অসিয়ত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এ সব হল আল্লাহর আদেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতি সহনশীল।

(সূরা নিসা, আয়াত ১২)

ইসলাম উত্তরাধিকার আইন খুবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। কুরআন-এ পরিপূর্ণ এবং ভিত্তিশীল মৌলিক বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এটা এতো পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত যে, যদি কোনো অংশীদাররা বিভিন্ন কৌশল ও বিন্যাসের সাথে এর ওপর দক্ষতা অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে এজন্য সারাজীবন ব্যয় করা প্রয়োজন হবে।

অরুন শূরী কী করে কুরআনের দু'আয়াত দ্রুত ও হালকা অধ্যয়ন থেকে এবং মাপকাঠি না জেনেই এ বিধান জানার জন্য নির্ভরযোগ্য হয়ে পড়লেন? এর দৃষ্টান্ত তার মতো যে, বীজগণিতের এক সরল সমাধান করার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু গণিতের মূল নিয়মের একটুও নয়। যা অনুযায়ী এ কথা অবশ্য জানা থাকতে হবে যে, গণিতের কোন চিহ্ন আগে আসবে– প্রথমে তো মৌলিক নিয়ম সমাধান করার প্রয়োজন।

প্রথমে আপনাকে ব্র্যাকেটের কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত যোগ ও বিয়োগের কাজ করতে হবে। যদি অরুন শূরী হিসাব সম্পর্কে অজ্ঞ হন এবং সরল অংকের প্রথমে গুণন দিয়ে শুরু করেন, এরপর বিয়োগ করেন, এরপরে ব্র্যাকেট করেন, এরপর ভাগের দিকে আসেন এবং সর্বশেষে যোগের কাজ করেন তাহলে নিশ্চিতই এর উত্তর ভুল হবে। এরূপভাবে ৪ নং সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকারের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে যদিও প্রথমে সন্তানদের অংশের উল্লেখ করেছে এরপরে পিতা-মাতা এবং স্বামী-স্ত্রীর অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে বলা হয়েছে, সবার আগে ঋণশোধ এবং কর্তব্য আদায় করতে হবে। এরপরে পিতা-মাতা এবং স্বামী-স্ত্রীর অংশ দিতে হবে যা এর ভিত্তিতে হবে যে, মৃত ব্যক্তি তার সন্তান রেখে এসেছে কিনা? এরপরে বাকি অংশ ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ মোতাবেক বন্টন করতে হবে। এভাবে করলে বেশি হবার প্রশ্ন আবার কোথায় থাকল? (যেমন আবদুল করিম পিতা-মাতা, স্ত্রী ও দুই ছেলে এক মেয়ে রেখে মারা গেল। বিধি মোতাবেক পিতা $\frac{১}{৬}$ + মাতা + $\frac{১}{৬}$ + স্ত্রী $\frac{১}{৮}$

তাহলে পিতা, মাতা ও স্ত্রী পাবে মোট সম্পত্তির

$\frac{৪+৪+৩}{২৪} = \frac{১১}{২৪}$ অংশ এবং বাকি $\frac{১৩}{২৪}$ অংশ পাঁচ ভাগ হবে এবং

প্রত্যেক ছেলে প্রত্যেক মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে পাবে। সুতরাং অংশ অবশিষ্ট থাকার বা যোগফল ১ এর অধিক হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এজন্য আল্লাহ তাআলা গণিত জানেন না তা নয় বরং অরুন শূরী গণিতের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ।

প্রশ্ন : যদি আল্লাহ তাআলা কাফিরদের দিলে মোহর মেরে থা[illegible] ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তাদেরকে অপরাধী কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?

স্বভাবের নিরিখে অপরাধী হবে

উত্তর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার ৬-৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۔

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা কাফির হয়েছে, তাদের আপনি ভয় দেখান বা না দেখান, দু'টোই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের অন্তরের ওপর এবং তাদের কানের ওপর আর তাদের চোখের ওপর রয়েছে মূর্খতার পর্দা, অনন্তর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

এ আয়াতগুলো সাধারণ কাফিরদের জন্য নয়, যারা ঈমান আনেনি। আল কুরআনে এ জন্য إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়েছে, এর দ্বারা ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে যারা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'তুমি তাদের ভয় দেখাও বা না দেখাও তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তায়ালা এদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এদের কান ও চোখের ওপর পর্দা দিয়েছেন।' তাদের অন্তরের ওপর মোহর ও চোখের ওপর পর্দা দেয়ার কারণে তারা ঈমান আনেনি ব্যাপারটা তা নয় বরং ব্যাপারটা এর উল্টা। এর কারণ এই যে, এ ধরনের কাফির সকল অবস্থায় সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য লেগে থাকে এবং আপনি তাদের ভয় দেখান আর নাই দেখান তারা ঈমান আনবে না, এ জন্য এর দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নয় বরং কাফিরদের নিজের। ধরুন, এক শিক্ষক ফাইনাল পরীক্ষার আগে বললেন, 'অমুক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করবে, কারণ সে খুব দুষ্ট, পড়ার দিকে মনোযোগ নেই, নিজ চিন্তা ও মনোযোগ পরিপূর্ণ করে না।' যদি এ ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে তাহলে এ দোষ কার ওপর পড়বে, শিক্ষকের নাকি ছাত্রের ওপর? শিক্ষক তো এর ব্যাপারে অগ্রিম কথা বলেছেন, এ কারণে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। এরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারও প্রথম থেকে জানা আছে যে, কিছু লোক এমনও আছে যারা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য চেষ্টারত এবং আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। এ জন্য অমুসলিমদের ঈমান এবং আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তাদেরই।

প্রশ্ন : আল-কুরআনে রয়েছে– আল্লাহ তাআলা কাফিরদের দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন। সে কখনো ঈমান আনবে না। অথচ বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, জ্ঞান ও বুঝ এবং ঈমান কবুল করার কাজ দেমাগের (মস্তিকের)। তাহলে কুরআনের এ দাবি কি বিজ্ঞানের বিপরীত নয়?

'কলব' শব্দেই রয়েছে সঠিক অর্থ

উত্তর : আল-কুরআনের সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۔

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা কাফির হয়েছে, তাদের আপনি ভয় দেখান বা না দেখান, দু'টোই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের অন্তরের ওপর এবং তাদের কানের ওপর, আর তাদের চোখের ওপর রয়েছে মূর্খতার পর্দা, অনন্তর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

আরবি قَلْبٌ শব্দ দ্বারা অন্তর, হৃদয়, মন, আত্মা, হৃদপিন্ড, কেন্দ্র ইত্যাদি বোঝায়। এ সকল আয়াতে যে قَلْبٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর উদ্দেশ্য অন্তর ও মেধা উভয়ই। এ জন্য এ সকল আয়াতের অর্থ এটাও যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফিরদের অনুধাবন শক্তির যোগ্যতার ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। এ জন্য সে বোঝে না এবং ঈমানও আনে না। আরবি قَلْبٌ জ্ঞান ও বুঝের কেন্দ্র অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতেও এরূপ শব্দ প্রচুর আছে যা শাব্দিক অর্থ থেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'Lunatic' শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'চান্দ্রিক', চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত। আজ সকল লোক এ শব্দটিকে ঐ লোকের জন্য ব্যবহার করে যে পাগল অথবা মস্তিষ্কের সমস্যার শিকার। এ কথা সকলেই জানে যে, কোনো পাগল কিংবা মস্তিষ্কের রোগী চান্দ্রপীড়িত নয়। এ সত্ত্বেও ডাক্তাররা এ শব্দ ব্যবহার করে। এটা কোনো ভাষার সাধারণ পরিবর্তনের একটা উদাহরণ। এ পরিভাষা এমন ভুল ধারণার সাথে চালু হয়ে গেছে যে, চাঁদের পরিবর্তনগুলো বিরাট প্রভাব ফেলে। কবি মহোদয়গণ চাঁদের সঙ্গে প্রেম ও পাগলামির উল্লেখ বেশিরভাগ করে থাকেন। Disaster এর অর্থ হলো একটি কুলক্ষণে তারকা। কিন্তু আজ সকলে এ শব্দ হঠাৎ করে অবতীর্ণ হওয়া দুর্ভাগ্য অথবা বিপর্যয়ের জন্য ব্যবহার করে থাকে। যদিও আমরা সবাই জানি, দুর্ভাগ্যের সাথে কুলক্ষণে তারকার কোনো সম্পর্ক নেই। Sunrise অর্থ সূর্যোদয়। লোকেরা এ বিষয়ে অজ্ঞ নয় যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র

করে ঘোরে। জ্ঞানবানদের এ তথ্য জানা আছে, সূর্য কখনো
এতদসত্ত্বেও আকাশ গবেষকগণও এ শব্দ ব্যবহার করে। এরূপভাবে Sunset বা সূর্যাস্ত সম্পর্কে আমরা জানি সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না, তা সত্ত্বেও এ কথা বলা হয়ে থাকে।

ইংরেজিতে ভালোবাসা ও আবেগের স্থান হলো হার্ট। হার্ট দ্বারা বোঝায় শরীরের ঐ অংশ যা রক্তকে পাম্প করে। এ শব্দ অন্তরের খেয়াল, ভালোবাসা এবং আবেগের কেন্দ্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আজ আমরা জানি যে খেয়াল, ভালোবাসা ও আবেগের কেন্দ্র হচ্ছে দেমাগ বা মস্তিষ্ক। তারপরও যখন কোনো লোক নিজের আবেগ প্রকাশ করে তখন বলে 'আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে চাই'। একটু বোঝার চেষ্টা করুন, এক বিজ্ঞানী যখন নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে এ কথা বলবে– তুমি তো বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নও যে আবেগের কেন্দ্র হলো মস্তিষ্ক, হার্ট নয়– তাহলে সে কি এ কথা বলবে যে 'আমি তোমাকে মস্তিষ্কের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসি?' সে এরূপ বলবে না, বরং স্ত্রীর বক্তব্যই গ্রহণ করবে; قَلْبٌ শব্দ ধারণার কেন্দ্র এবং জ্ঞান ও বুঝের ওপর বলা হয়। কোনো আরব এ কথা কখনো বলবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফিরদের দিলে বা অন্তরে কেনো মোহর মারলেন? বলবে না এ কারণে– সে এ কথা ভালোভাবে জানে যে এর দ্বারা মানুষের ধারণা, চিন্তা এবং আবেগের কেন্দ্র বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন : আল কুরআন এ কথা বলে যে, যখন কোনো পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হুর অর্থাৎ সুশ্রী সঙ্গিনী পাবে। কোনো নারী জান্নাতে গেলে সে কী পাবে?

'বিশেষ কিছু' বা 'সাথী' (হুর) পাবে

উত্তর : 'হুর' শব্দটি কুরআনে কমপক্ষে চার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে–

সূরা দুখান এর ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে– كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

অর্থ : এরূপভাবে আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গী বানাবো।

সূরা তুর এর ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে– وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

অর্থ : আমি তাদের জুড়ে দিব বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সঙ্গে।

সূরা আর রাহমান-এর ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ

অর্থ : এই হুররা তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিত।

সূরা ওয়াকিয়াহ্ ২২ ও ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَحُوْرٌ عِيْنٌ . كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ .

অর্থ : তাদের জন্য থাকবে সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ আয়তলোচনা হুর।

কুরআনের অনুবাদকারীরা حُوْرٌ শব্দের অনুবাদ বিশেষ করে উর্দু অনুবাদকারীরা 'সুশ্রী সুন্দরী বালিকা' করেছেন। এ অবস্থায় তারা শুধু পুরুষের জন্যই, তবে নারীদের কী হবে? حُوْرٌ শব্দটি মূলে اَحْوَرُ অথবা حَوْرَاءُ উভয় বহুবচনের শব্দ। এটা ঐ সকল লোকের দিকে ইঙ্গিত করে যাদের চোখগুলো حُوْرٌ যেমন হয়, যা জান্নাতে প্রবেশকারী পুরুষ বা নারীদের রূহ প্রশান্ত করবে। যা বিশেষ গুণ এবং এটা আত্মিক চোখের সাদা অংশের প্রান্ত রংকে প্রকাশ করে। কুরআনের অনেক আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, জান্নাতে তোমাদের জন্য اَزْوَاجٌ অর্থাৎ জুড়ি হবে এবং তোমাদের জোড়া বা পবিত্র সঙ্গী মিলবে। আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তাআলা ২ নং সূরা বাকারার ২৫ নং আয়াতে বর্ণনা করেন–

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ . كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا . قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا . وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ . وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

অর্থ ঃ অতঃপর যারা (এর উপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের সুসংবাদ দিন এমন এক জান্নাতের, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। যখনি তাদের এ জান্নাতের কোনো একটি ফল দেওয়া হবে, তারা বলবে, এ ধরনের ফলতো ইতিপূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিল। তাদের এমনি ধরনের জিনিসই সেখানে দেয়া হবে। তাদের জন্যে আরো সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিণী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৪ নং সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا . لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا .

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার পাদদেশ দিয়ে প্রস্রবণ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রীগণ থাকবে, আর আমি তাদের চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব।

সুতরাং حُوْرٌ শব্দ কোনো বিশেষ জাতির জন্য প্রযোজ্য নয়। আল্লামা মু
حُوْرٌ এর অনুবাদ করেছেন Spouse অর্থাৎ, স্বামী/স্ত্রী। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এর অনুবাদ Companion অর্থাৎ, সাথী করেছেন। অনেক আলিমের মতে, জান্নাতে কোনো পুরুষের যেমন হুর মিলবে, তারা চমৎকার বড় বড় উজ্জ্বল চোখবিশিষ্ট হবে। অনেক আলিম এটাও বলেন, কুরআনে যে حُوْرٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর দ্বারা নারীই বুঝানো হয়েছে। কারণ এদের বিষয়ে উল্লেখ পুরুষের সাথে করা হয়েছে। সকলের গ্রহণযোগ্য এর উত্তর হাদীসে দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে এ প্রশ্ন এলো যে, যদি পুরুষদের জান্নাতে হুর দেয়া হয়, তাহলে নারীদের কী দেয়া হবে? তিনি ইরশাদ করেন, নারীদের এ জিনিস মিলবে যা তাদের মনে কখনো উদয় হয়নি, তাদের কানে কখনো শ্রবণ করেনি, তাদের চোখ কখনো তা দেখেনি। অন্য কথায়, নারীদের জান্নাতে বিশেষ কিছু দেয়া হবে।

প্রশ্ন : কুরআনের কয়েক স্থানে বলা হয়েছে যে, ইবলিস একজন ফেরেশতা ছিল, কিন্তু সূরা কাহফে ইবলিস জ্বিন ছিল বলা হয়েছে। এ দ্বারা কি কুরআনের বৈপরীত্য প্রমাণিত হয় না?

ভাষার সৌকর্য বৈপরীত্য নয়

উত্তর : আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আদম ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতে রয়েছে—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ ۔

অর্থ : আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করলো। সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো।

এছাড়াও কুরআনে উল্লেখ রয়েছে—

- ৭ নং সূরা আরাফের ১১ নং আয়াতে।
- ১৫ নং সূরা হিজরের ১৩ ও ২৮ নং আয়াতে।
- ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈলের ৬১ নং আয়াতে।
- সূরা ত্বহার ১১৬ নং আয়াতে।
- ২০ নং সূরা সাদ এর ৭১ ও ৭৪ নং আয়াতে।

কিন্তু ১৮ নং সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াতে রয়েছে—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۔ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ ۔

অর্থ ঃ স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ "আদমকে সিজদা কর," তখন সবাই সিজদা করলো ইবলিস ব্যতীত। সে ছিল জ্বিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো।

সূরা বাকারায় বর্ণিত একাধিক আয়াতের প্রথম অংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবলিস একজন ফেরেশতা ছিলেন। কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরবি ভাষায় একটি সাধারণ নিয়ম আছে যাতে যদি অধিকাংশকে সম্বোধন করা হয়, তাহলে অল্পসংখ্যক এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন আমি ১০০ ছাত্রের একটি শ্রেণীতে বক্তৃতা করছি যার মধ্যে ৯৯ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী। আমি আরবিতে যদি বলি সকল ছাত্র দাঁড়িয়ে যাও, তা হলে এর প্রয়োগ ছাত্রীর উপরও পড়বে। আমাকে আলাদাভাবে ছাত্রীকে সম্বোধন করার প্রয়োজন নেই। এরূপভাবে কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন ফিরেশ্‌তাদের সম্বোধন করেছেন তখন ইবলিস সেখানে ছিল এবং এটা আবশ্যক ছিল না যে তাকে আলাদা উল্লেখ করতে হবে। এ জন্য সূরা বাকারা এবং অন্যান্য সূরায় ইবলিস ফেরেশ্‌তা হোক বা না হোক তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াত অনুসারে ইবলিস ছিল একজন জ্বিন। কুরআনের কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, ইবলিস একজন ফেরেশ্‌তা ছিল। এ জন্য আল কুরআনে এ ব্যাপারে কোনো বৈপরীত্য নেই।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, জ্বিনদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে চাইলে আনুগত্য অস্বীকার করতে পারে। তবে ফেরেশতাদের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি এবং তারা সবসময় আল্লাহর আনুগত্য করে থাকে। এ জন্য এ প্রশ্নের অবকাশ নেই যে, কোনো ফেরেশ্‌তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাফরমানি করবে। এটা থেকে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, ইবলিস ছিল একজন জ্বিন, ফেরেশ্‌তা নয়।

প্রশ্ন : কুরআনে এ কথা বলা হয়েছে যে, মারইয়াম (আ) (আ) এর বোন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যাদের দিয়ে কুরআন লিখিয়েছিলেন তারা কি এ কথা জানতো না যে, হারুন (আ)-এর বোন মারইয়াম (আ) ঈসা মসীহ-এর মাতা Mary থেকে ভিন্ন মহিলা ছিলেন, এবং এ দুজনের মধ্যে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) বছরের ব্যবধান ছিল?

ব্যবধান 'বংশধর' এর ভাষাগত পার্থক্য

উত্তর : আল-কুরআনের ১৯ নং সূরা মারইয়ামের ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۔ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۔

অর্থ ঃ পরে সে তার সম্প্রদায়ের কাছে সন্তানকে নিয়ে হাজির হল, তারা বলল, হে মরিয়ম! তুমি একটি অঘটন করেছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।

খ্রিস্টীয় মসীহ এ কথা বলছে যে, ঈসা মসীহ-এর মাতা মেরী ও হারুনের বোন মারইয়ামের মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ছিল না। অথচ দুজনের মধ্যে ছিল ১০০০ (এক হাজার) বছরের ব্যবধান। কিন্তু মসীহ জানে না যে, আরবিতে أُخْتُ এর অর্থ বংশধরও হয়, এজন্য লোকেরা মারইয়ামকে হারুনের أُخْتُ (বংশধর) বলে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর। বাইবেলে 'বেটা' শব্দটাও বংশধরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মথির ইঞ্জিল প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে রয়েছে– ঈসা মসীহ দাউদের বেটা (বংশধর)। লুক-এর ইঞ্জিল-এর ৩য় অধ্যায়ের ২৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

যখন ইচ্ছা স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগলো, ঐ সময়ে তিনি ছিলেন ৩০ বছরের যুবক এবং ইউসুফের বেটা (বংশধর) ছিলেন।

এক ব্যক্তির দুজন পিতা হতে পারে না। এ জন্য যখন এ কথা বলা হয় যে, ঈসা মসীহ হযরত দাউদ (আ)-এর বেটা ছিলেন তখন এর অর্থ হবে, মসীহ (আ) দাউদ (আ)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বেটা দ্বারা বংশধর বুঝানো হয়েছে। এ ভিত্তির ওপরে আল কুরআনের ১৯ নং সূরা মারইয়ামের ২৮ নং আয়াতের ওপর অভিযোগ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কেননা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে أُخْتَ هَارُونَ (হারুনের বোন)। এর দ্বারা হারুনের বোন নয় বরং হযরত মারইয়াম-এর মাতাকে বুঝানো হয়েছে যিনি হযরত হারুন (আ)–এর আওলাদ অর্থাৎ, তাঁর বংশধরদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন : কুরআনে কি এ কথা বলা হয় নি যে, ঈসা মসীহ আল্লাহর কালিমা আল্লাহর রূহ। এতে কি খোদায়িত্বের শান প্রকাশ পায় না?

ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা

উত্তর : কুরআন অনুযায়ী মসীহ (আ) 'আল্লাহর পক্ষ থেকে কালিমা', 'আল্লাহর কালিমা' নয়। সূরা আলে ইমরানের ৪৫ নং আয়াতে রয়েছে–

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۔

অর্থ ঃ স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতারা বললেন, হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তার তরফ থেকে তোমাকে প্রদেয় একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মসীহ ঈসা ইবন মরিয়ম। তিনি সর্বজন মান্য দুনিয়া ও আখিরাতে এবং তিনি আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম।

কুরআনে মসীহ (আ)-কে বুঝতে 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কালিমা' হিসেবে বলা হয়েছে। 'আল্লাহর কালিমা'- এর অর্থ নয়। আল্লাহর কালিমা অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পয়গাম বা সংবাদ। কারো ব্যাপারে যদি 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কালিমা' বলা হয়, তবে তার দ্বারা বুঝানো হয় তিনি আল্লাহর পয়গম্বর বা নবী। বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। যখন কোনো নবীকে কোনো উপাধি দেওয়া হয়, তখন এর দ্বারা আবশ্যকীয়ভাবে এটা বুঝায় না যে অন্য কোনো নবীর মধ্যে এ গুণ পাওয়া যাবে না। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কুরআনে 'খলীলুল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহর বন্ধু বলা হয়। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, অন্য নবী আল্লাহর বন্ধু নয়। হযরত মূসা (আ)-কে 'কলিমুল্লাহ' বলা হয়, যার দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহ তাআলা অন্য সকল নবীদের সঙ্গে কথা বলেননি। এভাবে মসীহ (আ)-কে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ, 'আল্লাহর কালিমা' বলা হয়। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে অন্যান্য নবী আল্লাহর কালিমা বা পয়গম্বর নন। হযরত ইয়াহইয়া (আ) যাকে খ্রিস্ট ইউহোন্না মিবাগ (John the Baptist) বলেন, এর মধ্যেও ঈসা (আ)-কে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে কালিমা বলা হয়েছে। ৩ নং সূরা আল ইমরানের ৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۔ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ۔

অর্থ : যাকারিয়া তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে একটি পূত পবিত্র সন্তান দান কর, তুমি তো প্রার্থনা শ্রবণকারী। তারপর যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া নামীয় এক সন্তানের, তিনি হবেন আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, সমাজ নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং নেককারদের মধ্যে থেকে একজন নবী।

কুরআনে হযরত মসীহ (আ)-এর উল্লেখ 'রুহুল্লাহ' হিসেবে নয় বরং সূরা নিসায় 'রুহুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রূহ বলা হয়েছে। ৪ নং সূরা নিসায় ১৭১ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন –

يَٰأَهْلَ الْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۔ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَٰثَةٌ ۔ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۔ سُبْحَٰنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۔ لَّهُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۔

অর্থ : হে কিতাবধারীগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিশ্চয় মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কুদরতের বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, এবং রুহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। তাই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বল না যে, আল্লাহ তিন জন। তা থেকে নিবৃত্ত হও, তাতেই তোমাদের মঙ্গল হবে। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হবে এটা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই, কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেয়া বলতে এটা বুঝায় না যে, হযরত ঈসাই (আ) মাবুদ (নাউযুবিল্লাহ)। আল-কুরআনে কয়েক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেন। যেমন ১৫ নং সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَٰجِدِينَ ۔

অর্থ ঃ অতঃপর আমি যখন তাকে সুঠাম করবো এবং আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবে।

৩২ নং সূরা আস সাজদার ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۔ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۔

অর্থ ঃ পরে তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রশ্ন : একথা কি সঠিক নয় যে, কুরআনের সূরা মারইয়ামের ৩৩ নং আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ ইন্তেকাল করলেন অতঃপর জীবিত করলেন এবং উঠিয়ে নিলেন?

জীবিত ঈসা (আ) এর পুনরাবির্ভাব ঘটবে

উত্তর : আল কুরআনে এ কথা কখনো বলা হয়নি যে হযরত ঈসা (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন, বরং তাঁর সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তাতে ভবিষ্যত নির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা মারইয়ামের ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۔

অর্থ : আমার ওপর শান্তি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন পুনরায় উত্থিত হবো।

কুরআনে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'শান্তি আমার ওপর যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি' এবং যেদিন আমি মরবো।' বাক্যে এ কথা বলা হয়নি যে, যেদিন আমি মরে গিয়েছিলাম। এখানে ভবিষ্যত নির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতীতকালে নয় আল কুরআনের সূরা নিসার ১৫৭ ও ১৫৮ নং আয়াতে আরো কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে–

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ . وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ . وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ . لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ . مَالَهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ . وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا . بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ . وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

অর্থ : আর তাদের উক্তি, "আমরা আল্লাহর রাসূল মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি"-এর জন্যও তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বাস্তবে তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করতে পারেনি, কিন্তু তাদের ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। অনন্তর যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা এ সম্বন্ধে সংশয়ে পতিত আছে এবং এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই শুধু ধারণা ছাড়া। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছিলেন, বাস্তবে আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

মূলত আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ)-কে ইহুদিদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এ সময় তিনি দাজ্জালের ফিতনা শেষ করবেন এবং সারা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করে ইন্তিকাল করবেন।